দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

পশ্চিমবঙ্গে মানবাধিকার ও তার ভবিষ্যৎ

— পৃঃ ১৪

বাংলার মেয়ে : টুকটুকি মণ্ডলের করুণ কাহিনি

— পৃঃ ২৭

৬৭ বর্ষ, ৪৯ সংখ্যা ।। ৩ আগস্ট ২০১৫ ।। ১৭ শ্রাবণ - ১৪২২ ।। website : www.eswastika.com

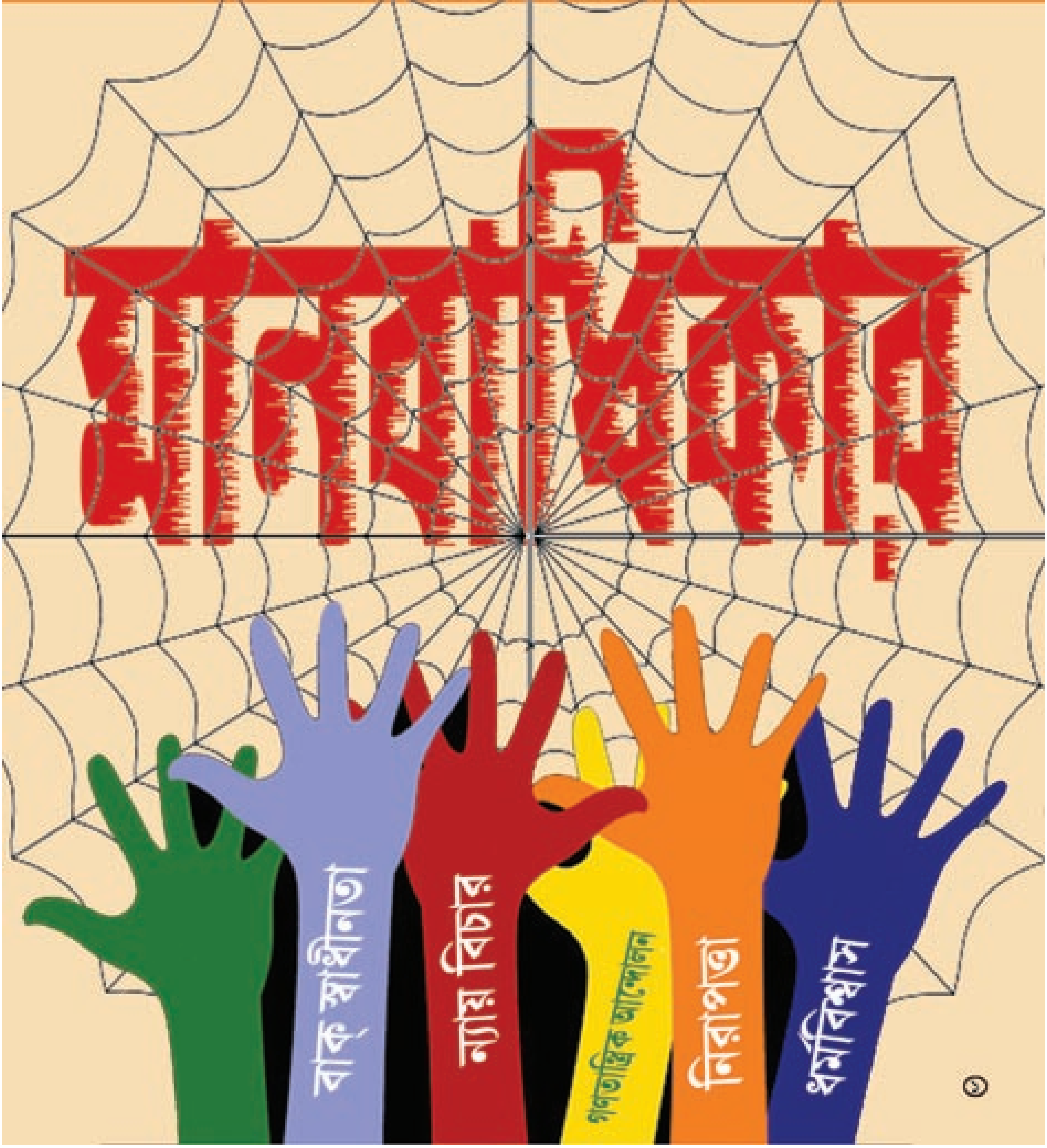

স্বস্তিকা

*।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত
বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।*

৬৭ বর্ষ ৪৯ সংখ্যা, ১৭ শ্রাবণ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ

৩ আগস্ট - ২০১৫, যুগাব্দ - ৫১১৭,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৯

রাহুল গান্ধীর অপরিণামদর্শিতার জন্য কংগ্রেস চিরকালের জন্য মুছে যাবে ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

খোলা চিঠি : লোকসভা-রাজ্যসভা টিভি চাইল্ড লক করুন ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১১

পাকিস্তানের সঙ্গে আপাতত সংঘর্ষের সম্পর্কই চলতে থাকুক ▯ দিব্যজ্যোতি চৌধুরী ▯ ১২

পশ্চিমবঙ্গে মানবাধিকার ও তার ভবিষ্যৎ ▯ ভাস্কর ভট্টাচার্য ▯ ১৪

পশ্চিমবঙ্গে বিপন্ন মানবাধিকার, অন্ধকারাচ্ছন্ন বর্তমান ▯ অম্লানকুসুম ঘোষ ▯ ১৭

ধর্মসংসদের স্রষ্টা ▯ ভি সম্মুগনাথন ▯ ২১

একটি উল্লেখযোগ্য দিকচিহ্ন ▯ রূপশ্রী দত্ত ▯ ২৩

বাংলার মেয়ে : টুকটুকি মণ্ডলের করুণ কাহিনি ▯ কাঞ্চন গুপ্ত ▯ ২৭

ওয়াহাবির উত্থান : আতঙ্কের যুগ কি ফিরে আসতে চলেছে? ▯ ২৯

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে প্রাণীবিজ্ঞান ▯ ৩০

হিন্দু, ইসলাম ও খৃষ্টান ধর্মতত্ত্বে নারীর তুলনামূলক অবস্থান ▯ অনসূয়া চন্দ ▯ ৩১

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ▯ **নবাঙ্কুর : ২৪-২৫** ▯ **অঙ্গনা : ২৬** ▯

অন্যরকম : ৩৩ ▯ **পুস্তক প্রসঙ্গ : ৩৫** ▯ **রঙ্গম : ৩৮-৩৯**

শব্দরূপ : ৪০ ▯ **প্রাসঙ্গিকী : ৪২**

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

১৫ আগষ্ট : ফিরে দেখা

১৫ আগষ্ট— ফিরে দেখার একটা দিন। অতীত-স্মৃতি মন্থন যা ভবিষ্যতের পাথেয়। এই প্রসঙ্গেই উঠে এসেছে ছেচল্লিশের দাঙ্গা। কেন না বাংলার আকাশে আবার সেই অশনি সংকেত। লিখেছেন ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস। একশো বছর আগে কলকাতার বুকে অস্ত্র লুণ্ঠনের মতো বিস্মৃতপ্রায় রোমহর্ষক ঘটনার কথা স্মরণ করিয়েছেন ড. রমা বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও থাকছে ঋষি শ্রীঅরবিন্দের প্রসঙ্গ।

সত্বর কপি বুক করুন। দাম একই থাকছে— দশ টাকা।।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল -
৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®
সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

বিপন্ন মানবাধিকার

সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়াছে দেশের সমস্ত রাজ্যের মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের শূন্যপদ তিন মাসের মধ্যে পূরণ করিতে হইবে। উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান পদ গত দুই বৎসর ধরিয়া খালি পড়িয়া রহিয়াছে। কারণ প্রাক্তন চেয়ারম্যান অশোক গঙ্গোপাধ্যায় যেভাবে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে একের পর এক মানবাধিকার ভঙ্গের অভিযোগে জরিমানার সুপারিশ করিতেছিলেন তাহাতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আতঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই আতঙ্কের কারণেই এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিয়ম ভাঙিয়া এক বশংবদ পুলিশ অফিসারকে অস্থায়ী চেয়ারম্যান হিসাবে বসাইয়াছেন। যাহাতে এই বশংবদ অফিসার সরকারের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের কোনো সুপারিশই করিতে না পারেন। পূর্বে এই অফিসারের বিরুদ্ধে একবার মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগও উঠিয়াছে। তবুও কেবল বশংবদ থাকিবার কারণেই তাঁহার এই পদে নিয়োগ। ঢাল-তরোয়ালহীন নিধিরাম এই কমিশনের এখন কাজ হইতেছে রাজ্য সরকারের দালালি করা। আর এই কারণেই কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়ম ভাঙিয়া দলীয় অনুষ্ঠানেও সরকারের উমেদারি করিতেছে। হাজার মানবাধিকার লঙ্ঘন হইলেও এই রাজ্যের মানুষ আর ভুল করিয়া পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশনের নিকটে অভিযোগ জানাইতে যান না, কারণ মানুষ বুঝিয়া গিয়াছেন এই কমিশনের কাছে অভিযোগ জানাইলেও কোনো সুরাহা হইবে না। অপরদিকে মানুষে অভিযোগ না করিবার কারণে কমিশন এই রাজ্যে মানবাধিকার আর লঙ্ঘন হইতেছে না বলিয়া আনন্দে ঢোল বাজাইতেছেন। গাধাকে চালাকি করিয়া ঘোড়া বানাইলে এই অবস্থাই হয়। 'জো হুজুর' আনন্দে নৃত্য করিলেও রাজ্যের মানুষের মানবতা নিয়ত বিপন্ন হইতেছে। এই রাজ্যের আট হইতে আশি বছর বয়সের কোনো মহিলাই আজ আর নিরাপদ নয়।

আইনত মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান পদে বসিবার অধিকার রহিয়াছে একমাত্র হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতির। গত তিন মাসে বিভিন্ন রাজ্যের প্রধান বিচারপতির পদ হইতে যাঁহারা অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা তিনজন বাঙালি বিচারপতি। কিন্তু এই পর্যন্ত তাঁহাদের কাহাকেও রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান পদ গ্রহণ করিবার জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ হইতে আমন্ত্রণ জানানো হয় নাই। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের ফলে ভবিষ্যতে কী হইবে তাহা ভবিষ্যতের বিষয়, কিন্তু বর্তমানে আইনত যিনি কমিশনের সদস্য হইবারই যোগ্য নন তাঁহাকে মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান করা হইয়াছে। এই অবৈধ কর্মের জন্য অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। সম্প্রতি সুপ্রিমকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি কে জি বালকৃষ্ণন যিনি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তিনিও কলকাতায় আসিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন, একজন প্রাক্তন পুলিশকর্তা কীভাবে মানবাধিকার কমিশনের দায়িত্ব পাইলেন। কিন্তু বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে উদ্ভটের রাজত্বে সবই সম্ভব। বস্তুত বামরাজত্বে যাহা অনৈতিক ছিল বর্তমানে তাহাই নৈতিক বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। শিক্ষক নিগ্রহ বামরাজত্বে খারাপ ঘটনা হইলেও বর্তমানে তাহা ছোট ঘটনা, নারী নির্যাতন এই রাজত্বে 'দুষ্টুছেলের কাজ', সুতরাং তাহা দোষণীয় নহে। সরকারি দলের বিরোধিতা করিলে হেনস্থা হইতে হইবে ইহাই নিয়ম হইয়া গিয়াছে। মানবিকতা শব্দটি বামরাজত্বে যেমন ছিল অতিবাম তৃণমূল রাজত্বে তাহাই রহিয়াছে। কেবল সরকার বদল হইয়াছে মাত্র কিন্তু বামরাজত্বের ন্যায় এই রাজত্বেও মানবিকতা হরণ বন্ধ হয় নাই।

সুভাষিতম্

সুলভাঃ পুরুষা লোকে সততং প্রিয়বাদিনঃ।
অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ।। (চাণক্য নীতি)
প্রিয়কথা বলার লোক সবসময় পাওয়া যায়। কিন্তু অপ্রিয় অথচ হিতকর কথার বক্তা ও শ্রোতা দুই-ই দুর্লভ।

মুখ খুললেন আই সি এইচ আর প্রধান

রামজন্মভূমি হিন্দুদেরই

রাজনীতি করতে বিতর্ক জিইয়ে রেখেছে কমিউনিস্টরা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারতীয় ইতিহাস গবেষণা পর্ষদ (আই সি এইচ আর) বরাবরই কমিউনিস্টদের আখড়া। ১৯৭২ সালে এর যখন জন্ম হয় তখন থেকেই এই সংস্থাকে বামপন্থী ঐতিহাসিকরা 'ঘুঘুর বাসা' বানিয়ে রেখেছেন। এবার সেই 'ঘুঘুর বাসা' ভাঙতেই তৎপর হলেন সংস্থার নবনিযুক্ত প্রধান ওয়াই সুদর্শন রাও। গত ২৫ জুলাই তিনি স্পষ্ট ভাষায় অভিযোগ করেছেন, রাজনৈতিক স্বার্থেই রামজন্মভূমি ইস্যুকে জিইয়ে রেখেছেন বামপন্থী ঐতিহাসিকরা। ওই মন্দির রামচন্দ্রের জন্মভূমি বলে যথেষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তাঁরা তা না মেনে বিতর্ক টিকিয়ে রেখেছেন বছরের পর বছর।

অখিল ভারতীয় ইতিহাস সঙ্কলন যোজনা আয়োজিত এক আলোচনাসভায় সুদর্শন আরও বলেন, এই মন্দির যে রামচন্দ্রের জন্মস্থান এবং দীর্ঘকালের হিন্দু মন্দির তার অনেক প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও মানতে চান না ওই বামপন্থী ঐতিহাসিকরা। মন্দিরের মধ্যে হিন্দু ধর্মের অনেক নিদর্শনও পাওয়া গেছে। সেসব প্রমাণ দেখে কট্টর মুসলমানরাও মেনে নেবেন, কিন্তু রাজনৈতিক অস্থিরতা জারি রাখার জন্য বামপন্থীরা বিতর্ক জিইয়ে রেখেছেন। অযোধ্যার বর্ণনা করতে গিয়ে আই সি এইচ আর-এর প্রধান নিজের অনুভূতি উল্লেখ করে বলেছেন, 'মন্দিরের সামনে হাঁটলেই রামায়ণের যুগে বাস করার অনুভূতি হয়, এটাকে কেউ রূপকথা ভাবতেই পারেন। তবে এটা আমার একান্ত নিজস্ব অনুভব।'

ওয়াই সুদর্শন রাও।

সুদর্শন রাওয়ের দাবি, অযোধ্যায় রঘুপতি রামচন্দ্র জন্মেছিলেন কিনা তা বোঝার জন্য অনুভব দরকার। পার্থিব প্রমাণ দিয়ে এর বিচার করা উচিত নয়। তা ছাড়া ধ্বংস করা রামমন্দিরের স্থাপত্যের মধ্যেও হিন্দু ধর্মের নিদর্শন পদ্ম, শঙ্খ, চক্র ইত্যাদির নকশা পাওয়া গেছে। কিন্তু সেসবকে গুরুত্ব না দিতে চেয়ে রাজনীতিকেই প্রাধান্য দিতে কমিউনিস্টরা খোদিত শিলালিপির দাবি তোলেন। এমনকী সেসব নিদর্শনও মন্দিরে পাওয়া গেছে। তবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এতটাই বেশি যে সেই সব প্রমাণকে স্বীকৃতি দিতে রাজি নন বামপন্থীরা। তাঁদের দাবি, এগুলো করসেবকদের কারসাজি। বাইরে থেকে এনে রামজন্মভূমি মন্দিরের ভিতর বসানো হয়েছে। যদিও প্রত্নতাত্ত্বিকরা অন্য কথা বলেন।

সুদর্শন রাও বলেন, বামপন্থী ঐতিহাসিকরা বাস্তব প্রমাণের ওপর বেশি নির্ভর করেন। পুরাতাত্ত্বিক গবেষণায় অনেক বাস্তব প্রমাণও পাওয়া গেছে, কিন্তু তাঁরা সেসব মানতেই চান না। তার ফলেই ধর্মীয় লড়াইয়ের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। কিন্তু ধর্মীয় বিশ্বাস নয়, মূল সমস্যা বামপন্থীরাই। কেউ যদি কোনো কিছু মানবে না বলে আগেই ঠিক করে রাখে তবে তাঁদের কোনো ভাবেই আর বিশ্বাস করানো যায় না। তাঁদের কাছে যে প্রমাণই তুলে ধরা হোক না কেন, তাঁরা গ্রহণ করতেই রাজি হন না। সত্য বুঝতে পেরেও এড়িয়ে যান। এটাই বামপন্থী ঐতিহাসিকদের বৈশিষ্ট্য বলে মনে করেন সুদর্শন রাও। এই প্রসঙ্গেই তাঁর দাবি, 'রামজন্মভূমি বিতর্ককে যদি ঐতিহাসিক সমস্যা মনে করা হয় তবে, দেশে তো অনেক মসজিদ দেখা যাবে যা কোনো মন্দিরের ওপর তৈরি করা হয়েছে। দক্ষিণ ভারতেই এমন অনেক মসজিদ আছে। যাঁরা প্রমাণ চান তাঁরা কি সেই সমস্ত মসজিদ সরিয়ে ফেলায় রাজি হবেন?'

আই সি এইচ আর প্রধানের আরও প্রশ্ন, 'মানুষের মনের বিশ্বাসের থেকে বড় আর কী প্রমাণ থাকতে পারে? যাঁরা রামে বিশ্বাস করেন, অযোধ্যায় রামের জন্মগ্রহণকে বিশ্বাস করেন তাঁদের ভাবাবেগেরও একটা গুরুত্ব আছে। এটা একজন সাধারণ মানুষও বুঝবেন।' রাও বলেন, রামায়ণের লেখক বাল্মীকি একজন ঐতিহাসিক ছিলেন, তিনিই প্রথম ইতিহাস লেখক আর বাস্তব প্রমাণের ওপর ভিত্তি করেই তিনি রামায়ণ লিখেছিলেন।

অখিল ভারতীয় ইতিহাস সঙ্কলন যোজনা আয়োজিত আলোচনা সভায় রাও ছাড়াও ছিলেন ইতিহাসবিদ মীনাক্ষী জৈন। রামজন্মভূমি- বাবরি মসজিদ মামলায় এলাহাবাদ হাইকোর্টে কী কী প্রমাণ দাখিল করা হয়েছে তার উল্লেখ করে মীনাক্ষী জৈন বলেন, শুধু শুধুই বিতর্ক জিইয়ে রাখা হয়েছে। ওই সৌধে যে দীর্ঘকাল ধরে হিন্দু উপাসনা চলে আসছে তার যথেষ্ট প্রমাণ আদালতে জমা পড়েছে। অপর দিকে সেখানে যে নমাজ পড়া হোত তার সামান্যই প্রমাণ দাখিল হয়েছে।

ইন্দিরার জারি নোটিফিকেশন বাতিল করতে চলেছে বিজেপি সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ৪৪ বছর আগে একটি নোটিফিকেশন জারি করেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। কিন্তু আজও তা অব্যাহত। এবার সেই নোটিফিকেশন রদ করতে তৎপর হয়েছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। ১৯৭১ সালের ২৯ নভেম্বর কংগ্রেস সরকার একটি নোটিফিকেশন জারি করে, যেখানে উল্লেখ করা হয়, ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চের (মধ্যরাত) পর পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ অধুনা বাংলাদেশ থেকে যাঁরা ভারতে আশ্রয় নেবেন শরণার্থী হিসাবে তাঁদের নাম নথিভুক্ত করা হবে। কিন্তু তাঁদের ভারতের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে না। যদিও পাকিস্তান থেকে আগত শরণার্থীদের অবলীলায় ভারতের নাগরিকত্ব দান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, পূর্ববঙ্গ থেকে আগত শরণার্থীদের ভারতের নাগরিকত্ব না দেওয়ার পিছনে প্রধান কারণ ছিল আগত শরণার্থীরা হিন্দু বাঙালি। তাই নাগরিকত্ব দানে ইন্দিরার আগ্রহ ছিল না। অথচ পাকিস্তান থেকে যাঁরা শরণার্থী হিসেবে এসেছিলেন তাঁরা ভারতের নাগরিকত্ব পেয়েছেন।

ইন্দিরা গান্ধীর পর যে সরকার বা যিনি প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন তার কাউকেই দেখা যায়নি ইন্দিরার এই নির্দেশ বাতিল করতে। ভারতের ৬৮ বছরের স্বাধীনতায় বেশিরভাগ সময়টাই দেশের কুর্সি দখল করেছিল কংগ্রেস সরকার, যারা ভারতের হিন্দুদের প্রতি কোনোদিনই সহৃদয় ছিল না। স্বভাবতই হিন্দু বাঙালিরা লাঞ্ছিত এবং অবহেলিত হয়েছেন ততদিন। এবার সেই নীতি বদলে ফেলতে আগ্রহী কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। কারণ তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের সিদ্ধান্তের কুফল আজও ভোগ করে চলেছেন অসমের অগুনতি হিন্দু বাঙালি। মূলত যাঁরা ধর্মীয় আগ্রাসন, নিপীড়নের মুখে পড়ে বাংলাদেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের দিকে ফিরে তাকাননি ইন্দিরা গান্ধী। এমনকী অটলবিহারী বাজপেয়ী ব্যক্তিগত ভাবে এই নির্দেশ বাতিল করতে তৎপর হলেও শরিক দলগুলির চাপের কাছে তিনি নতিস্বীকার করতে বাধ্য হন। নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর তিনি প্রথম থেকেই চেয়ে এসেছেন এই নোটিফিকেশন রদ করতে। অবশেষে অসমের হিন্দু বাঙালিদের উদ্বাস্তু তকমা এবার ঘুচতে চলেছে। এবার তারাও নাগরিকত্ব পাবে এই আশায় বুক বেঁধেছে। এ প্রসঙ্গে রাজ্যের বিশিষ্ট আইনজ্ঞ হাফিজ রশিদ বলেন, ‘চার দশকের পুরনো এই নিয়ম যতদিন কার্যকরী থাকবে ততদিন পূর্ববঙ্গ থেকে আগত হিন্দু বাঙালিদের নাগরিকত্ব দেওয়া সম্ভব নয়। তাই সরকারের উচিত শীঘ্রই এই নোটিফিকেশন বাতিল করা।”

কালো দিন—২৯ নভেম্বর, ১৯৭১

এই দিনে জারি করা নোটিফিকেশনে পরিষ্কার বলা হয়েছে, ‘১৯৭১ সালের ২৪ মার্চের পর (মধ্যরাত) পূর্বপাকিস্তান থেকে যাঁরা ভারতে আশ্রয় নেবেন, শরণার্থী হিসাবে তাঁদের নাম নথিভুক্ত করা হবে। কিন্তু তাঁদের ভারতের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে না।’

পাশাপাশি অসম বিজেপি-র সাধারণ সম্পাদক ডাঃ রাজদীপ রায় জানান, ‘পূর্ববঙ্গ থেকে আগত হিন্দুদের অচিরেই নাগরিকত্ব দেওয়ার ব্যবস্থা করছে বিজেপি।’

Swachchha Bharat Swabolombee Bharat

How to build a nice home, think of us

WE PROVIDE :-

+ Low Cost readymade Latrine (Toilet) + Low Cost House
+ Low Cost Domestic Dustbin & Domestic Biogas Plant
+ Heat & Waterproof Solution for your heated roof.

Contact

ABC ENGINEERS & SERVICES

"PARK PLAZA" Room No. 11 & 12, 71, Park Street,
Kolkata - 700 016

M : 98311 85740, 98312 72657,

Visit Our Website : www.calcuttawaterproofing.com

গোধরাকাণ্ডের প্রধান অভিযুক্ত ১৩ বছর পর ধৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রায় ১৩ বছর পর গোধরা কাণ্ডের প্রধান অভিযুক্ত হুসেন সুলেমান মহম্মদ মধ্যপ্রদেশের ঝাবুয়াতে পুলিশের জালে ধরা পড়ল। ২০০২-এর ফেব্রুয়ারি মাসে গোধরা রেলস্টেশনে সবরমতী এক্সপ্রেসের এস-৬ কামরায় আগুন ধরিয়ে অযোধ্যা ফেরত করসেবকদের পুড়িয়ে মারা হয়। এই ঘটনারই প্রতিক্রিয়ায় শুরু হয় গুজরাটে দাঙ্গা। হুসেন (৩৫) এত বছর ধরে নিজের পরিচয় পালটে মধ্যপ্রদেশের ঝাবুয়াতে অটো ড্রাইভারের কাজ করত। গোধরা ক্রাইম ব্রাঞ্চের ইন্সপেক্টর ডি জে চাভডা (chavda) জানিয়েছেন হুসেনকে আদালতে পেশ করা হয়েছে এবং আদালতের নির্দেশে তাকে ১২ দিনের পুলিশি হেফাজতে রাখা হয়েছে। হুসেনের সঙ্গে গোধরা কাণ্ডের আর এক অভিযুক্ত কাদির আবদুল গনি-কে গত ১৬ জুলাই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। হুসেন গোধরা স্টেশনে চা বিক্রি করত। গোধরা কাণ্ডে তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়েছে জানতে পেরে সে সেখান থেকে ১২০ কিলোমিটার দূরে ঝাবুয়াতে পালিয়ে যায়। ইতিমধ্যে সে বিয়েও করেছে এবং ২টি সন্তানের বাবা। রমজানের সময় গোধরাতে না এলে সে হয়তো আরও কিছুদিন গ্রেপ্তার এড়িয়ে থাকতে পারত। ঝাবুয়াতে থাকার সময় সে তিনবার বাসা বদল করেছে। সম্প্রতি সে ঝাবুয়ার ১৭নং ওয়ার্ডের বিবেকানন্দ কলোনিতে বাসা ভাড়া করে থাকত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ওই নৃশংস ঘটনায় ৫৯ জন করসেবককে পুড়িয়ে মারা হয় এবং এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে গুজরাট দাঙ্গায় ১২০০ মানুষ নিহত হয়।

পুণা ফিল্ম ইনসটিটিউট-এ অধ্যাপককে ছাত্রদের হুমকি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সঞ্জয়-জয়ন্ত চান্ডেকার নামের ‘কম্যুনিটি রেডিও প্রসার’ বিভাগের এক প্রবীণ অধ্যাপক পুণের এফ টি আই আই-তে জারি থাকা মাসাধিকব্যাপী পড়ুয়া ধর্মঘটের বিরোধিতা করে বলেন, এই আবাসিক প্রথমশ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি বেশ কিছুকাল ধরেই নেশাসক্ত, গুণ্ডা ও অসামাজিক লোকজনের আবাসস্থল হয়ে উঠেছে।’ তাঁর বক্তব্য চাউর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ধর্মঘটিদের মধ্যে শোরগোল পড়ে যায়। ফোনে তাঁকে হুমকি দেওয়া হয়। সংবাদে প্রকাশ, এই পরিস্থিতিতে তিনি নিরাপত্তার কারণে সাতদিনের ছুটিতে চলে গেছেন। সংস্থার পরিচালক প্রশান্ত পাথরারের কাছে এক লিখিত অভিযোগে তাঁর প্রাণহানির আশঙ্কা ও নিরাপত্তাহীনতার কথা ব্যক্ত করেছেন। ইতিমধ্যে কেন্দ্রের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের কর্তা ব্যক্তিরা ধারাবাহিক বিক্ষোভের প্রেক্ষিতে সংস্থার পঠন-পাঠন ও পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কথা চিন্তা করে শৃঙ্খলা ফেরাতে কঠিন ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভাবতে শুরু করেছেন। প্রসঙ্গত এই লাগাতার বিশৃঙ্খলার পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের পক্ষে নিযুক্ত একটি তদন্ত দল জানিয়েছে নয় নয় করে চল্লিশ জন প্রাক্তন ছাত্র প্রতিষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা চালিয়ে যাচ্ছে। এই শিক্ষার্থীদের পাঠক্রম দীর্ঘদিন আগে শেষ হয়ে গেলেও এরা ক্যাম্পাস ছাড়ছে না। মন্ত্রণালয় সূত্রে আরও জানা যাচ্ছে, জারি থাকা ডামাডোলের পরিপ্রেক্ষিতে চলতি শিক্ষাবর্ষে ৯ আগস্টের নির্ধারিত ভর্তির পরীক্ষা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। যার ফলে ভর্তি প্রক্রিয়াও অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। একটি আলাদা সাংবাদিক সম্মেলন করে অধ্যাপক চান্ডেকার বলেন, ‘তিনি আরও চারজন সমমনস্ক অধ্যাপককে নিয়ে সম্প্রতি ‘Save FTII’ নামে একটি সংগঠন তৈরি করেছেন। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানে কেবলমাত্র ছাত্রদেরই বাক স্বাধীনতা বা মত প্রকাশের স্বাধীনতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। অধ্যাপক বা প্রতিষ্ঠানের অন্য কর্মীরা স্বাধীন মত প্রকাশ করলেই হুমকির মুখে পড়ছেন। তাঁদের অনেককেই নীরবে সব কিছু দেখে যেতে হচ্ছে। তিনি প্রতিবাদ করায় ছাত্রেরা তাঁর ঘরে ঢুকে তাঁকে অশ্রাব্য গালিগালাজ ও হুমকি দেওয়ায় তিনি পালিয়ে বাঁচতে গেলে ছাত্ররা তাঁকে ধাওয়া করে। এই পরিস্থিতি কোনো দায়িত্ববান অধ্যাপকের পক্ষে মেনে নেওয়া যায় না।’ তিনি এফ টি আই আই-এর রেজিস্টার ইউ সি বোডা-র কাছে তাঁর প্রতিবাদপত্রটি কেন্দ্রের কাছে পাঠানোর আবেদন জানিয়েছেন।

শালবাড়িতে জেহাদি আক্রমণ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ জেহাদি আক্রমণের মুখে এবার শিলিগুড়ির শালবাড়ি এলাকার স্থানীয় হিন্দু বাসিন্দারা। যার জেরে শালবাড়ি এলাকার ত্রিরত্ন গুম্ফা এলাকাটি এক রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। ঘটনার সূত্রপাত গত ১৯ জুলাই। সেদিন সকালে এক রিক্সাচালক এবং এক বাইক আরোহীর মধ্যে দুর্ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, নেশাগ্রস্ত রিক্সাচালক রিক্সা থেকে নেমে এসে বাইক আরোহীকে চড় থাপ্পড় মারতে থাকে। ফলে দু’জনের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়ে যায়। এখানেই থেমে থাকেনি ওই মাতাল মুসলমান রিক্সাচালক। ঘটনাস্থল থেকেই ওই মুসলমান রিক্সাচালক ফোন করতে থাকে। মিনিট কয়েকের মধ্যেই প্রায় তিনশো সশস্ত্র মুসলমান যুবক ঘটনাস্থলে থাকা স্থানীয় বাড়িঘর, দোকানপাট তারা ভাঙচুর করে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ‘এরা জঙ্গি সংগঠন ‘আই এস আই এস জিন্দাবাদ’ ‘মিশন কাশ্মীর জিন্দাবাদ’, ‘পাকিস্তান জিন্দাবাদ’ বলে ধ্বনি দিতে থাকে। স্থানীয় হিন্দুদের উদ্দেশ্যে নানান হুমকিও দিতে থাকে তারা।

এসব করেই ক্ষান্ত থাকেনি এই তারা। এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা গণেশ প্রধানের বাড়িতে হামলা চালায়। যাঁর সঙ্গে এই ঘটনার কোনো সম্পর্ক নেই বলেই জানান স্থানীয় বাসিন্দারা। এই ঘটনার পর শালবাড়ি এলাকার স্থানীয় প্রায় ২০০ জন হিন্দু স্থানীয় প্রধাননগর থানায় এফ আই আর দায়ের করে। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারের কাছেও লিখিত অভিযোগ জানানো হয়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। পুলিশের সঙ্গে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে পুলিশ জানায় তদন্ত চলছে।

মুন্সীরহাটে স্কুল চলাকালীন ছাত্রের ওপর হামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি।। স্কুল চলাকালীন স্কুলের মধ্যে ঢুকে একাদশ শ্রেণীর এক ছাত্রকে বেধড়ক মারধর করলো বহিরাগত মুসলমান যুবকরা। ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়া জেলার মুন্সীরহাটে ব্রাহ্মণপাড়া চিন্তামণি ইনস্টিটিউশনে। জানা যায়, গত ২৩ জুলাই একাদশ শ্রেণীর ছাত্র গোরাচাঁদ সাঁতরা তার এক মুসলমান সহপাঠিনীর সঙ্গে রসিকতা করে। যার জেরে ক্লাস চলাকালীন ওই দিনই এই মুসলমান ছাত্রী স্কুলে কোনোরকম অভিযোগ না জানিয়ে তার পরিবার এবং পাড়ার কিছু যুবককে স্কুলে ডেকে এনে ওই হিন্দু ছাত্রটিকে মারধর করতে প্ররোচিত করে। স্কুল সূত্রে খবর, একাদশ শ্রেণীর ওই ছাত্রীর সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব রয়েছে ওই ক্লাসেরই আর এক ছাত্র শামিম ইসলামের। এই শামিমকে নিয়েই রসিকতা করেছিল এন.সি.সি.-র চতুর্থবর্ষ প্রশিক্ষিত গোরাচাঁদ। ফলস্বরূপ মারধর করে ওই ছাত্রীর পরিবারের লোকজন। চিন্তামণি ইন্সটিটিউশনের একাধিক ছাত্র-ছাত্রীর মত, শামিম এবং ওই ছাত্রীর গভীর সম্পর্কের কথা প্রায় সকলেরই জানা। তাই গোরাচাঁদের এই দু'জনকে নিয়ে করা রসিকতাকে কটূক্তি ভেবে পরিবারের লোকজনকে ডেকে পাঠায় ওই ছাত্রী।

ছাত্রছাত্রীদের দাবি, ক্লাসের শিক্ষক বা প্রধান শিক্ষকের কাছে এ বিষয়ে কোনোরকম অভিযোগ না জানিয়ে পরিবারের লোকজনের কাছে নালিশ জানানো উচিত হয়নি ছাত্রীটির। এ প্রসঙ্গে স্কুলের এক শিক্ষক বলেন, কারোর ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়ে রসিকতা করা বা কটূক্তি করা যেমন উচিত হয়নি ওই ছাত্রের, তেমনি এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গোরাচাঁদের কী শাস্তি হওয়া উচিত সেটাও ঠিক করার কথা নয় ওই ছাত্রীর পরিবারের। বরং তাদের পক্ষ থেকে প্রধান শিক্ষকের কাছে অভিযোগ জানানো উচিত ছিল। এ ব্যাপারে ছাত্রীর পরিবারের সঙ্গে কোনোরকম যোগাযোগ করা যায়নি এবং জখম ছাত্রটিও স্কুলে উপস্থিত না থাকায় যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

তবে অভিভাবকরা স্কুলের নিরাপত্তা বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। কারণ স্কুল চলাকালীন ক্লাস থেকে বের করে এনে স্কুল প্রাঙ্গণে ফেলে এই হিন্দু ছাত্রটিকে কিল, চড়, ঘুসি মারতে থাকে বহিরাগতরা। ফলে এই ঘটনায় স্কুল চত্বরে এক চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ঘটনা চলাকালীন এক ছাত্র ১০০ নম্বর ডায়াল করে গ্রামীণ এসপি অফিসে বিস্তারিত জানালে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে স্থানীয় জগৎবল্লভপুর থানার পুলিশ। তবে প্রধান শিক্ষক চিন্ময় কুমার পুলিশের কাছে এ বিষয়ে কোনোরকম অভিযোগ না জানিয়ে নিজেদের মধ্যে বিষয়টি মিটিয়ে নেওয়ার আশ্বাস দেন। স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা এই ঘটনার প্রতিবাদ করতে উদ্যত হলে প্রধান শিক্ষক সে ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করেন। ফলে ছাত্ররা পিছিয়ে আসতে বাধ্য হয়। এ বিষয়ে তাঁকে ফোন করা হলে তিনি বিষয়টি সম্পূর্ণ এড়িয়ে যান এবং এই ঘটনা সম্পর্কে কিছু জানাতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, 'এ ব্যাপারে ফোনে কিছু বলতে চাই না।' জগৎবল্লভপুর থানার ওসি কৌশিক ব্যানার্জী বলেন, 'এ ঘটনায় স্কুলের পক্ষ থেকে বা জখম ছাত্রের পরিবারের দিক থেকে কোনোরকম অভিযোগ দায়ের করেনি। আমরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গেলে তা নিজেদের মধ্যে মিটিয়ে নেওয়ার আশ্বাস দেন প্রধান শিক্ষক। তাই আমরা কোনোরকম ব্যবস্থা নিইনি।' স্কুলের মধ্যে এই ঘটনা ঘটায় অভিভাবকদের মধ্যে আশঙ্কা যেমন দেখা দিয়েছে সেই সঙ্গে স্কুলের নিরাপত্তা নিয়েও তাঁদের মনে প্রশ্ন চিহ্ন খাড়া হয়েছে। তাদের দাবি, 'স্কুলের মধ্যে এই ঘটনা কখনই আশাপ্রদ নয়। আগামীদিনে আমাদের ছেলেমেয়েদের কোনো ভুলের জন্য বাইরের কেউ শাস্তি স্বরূপ এরকম ঘটনা ঘটাবে না তা কে বলতে পারে।' কিন্তু এ বিষয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে তৃণমূল পরিচালিত স্কুল পরিচালন সমিতিও।

চাকুলিয়ায় বনবাসীদের বাড়িঘর পোড়াল দুষ্কৃতীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি।। গত ২১ জুলাই উত্তর দিনাজপুর জেলার চাকুলিয়া থেকে দু' কিলোমিটার দূরে স্থানীয় ভাটিয়া মুসলমানদের দ্বারা আক্রান্ত হলো ১০টি বনবাসী পরিবার। সাঁওতাল পরিবারের পুরুষ ও মহিলারা মাঠের কাজে বাড়ির বাইরে থাকার সুযোগ নিয়ে স্থানীয় সাবদুর আলির ছেলে সাহেব, সাকির, মুকিম ও নাসিরের নেতৃত্বে ২০০/২৫০ জন মুসলমান দুষ্কৃতী সাঁওতালদের বাড়িঘর আগুন লাগিয়ে দেয় ও ট্রাক্টর চালিয়ে তাদের জমির ধান নষ্ট করে দেয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ১০টি সাঁওতাল পরিবার ৪০ বছর ধরে ২৮ বিঘা ভেস্ট জমিতে চাষাবাদ করে। ভাটিয়া মুসলমানরা দীর্ঘদিন ধরে জমিগুলি দখলের জন্য নানাপ্রকার গণ্ডগোল করতে থাকে। আক্রান্ত কার্তিক মুর্মু জানান দুষ্কৃতীরা তাঁর সহ গ্রামের প্রধান কিস্কু, কানু সরেন, বাইলো হাসদা, শুকলা হাসদা, মঙ্গল হাসদা, মণিরাম হাসদা, সরোজ সরেন, চুনু সরেন ও এগেয়ার কিস্কুর বাড়িঘর আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে। সূত্রের খবর, প্রশাসন কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ায় এলাকার সাঁওতালরা ক্ষোভে ফুঁসছে। তাদের দাবি পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনোরকম ব্যবস্থা নেয়নি পুলিশ। স্থানীয় মানুষের ধারণা, অভিযুক্তরা শাসকদলের ছত্রছায়ায় থাকার কারণে পুলিশ কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

রাহুল গান্ধীর অপরিণামদর্শিতার জন্য কংগ্রেস চিরকালের জন্য মুছে যাবে

গূঢ় পুরুষের কলম

বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ এবং রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী বসুন্ধরা রাজের পদত্যাগের দাবিতে সংসদে চলতি বাদল অধিবেশন স্তব্ধ করে রেখেছে কংগ্রেস দল ও তার বন্ধুরা। প্রথমেই বলে রাখা ভাল যে সংসদে কোনো রাজ্যের নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ চাওয়া যায় না। দেশের সংবিধান সাংসদদের এই অধিকার দেয়নি। মনে হয়, কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী এবং তাঁর পুত্র দলের ভাইস প্রেসিডেন্ট রাহুল দেশের সংবিধান পড়েননি। তাই গলাবাজি করে সংসদের অধিবেশন ভণ্ডুল করছেন।

বাদল অধিবেশনের প্রথম সপ্তাহে বিতর্কের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের ৯১ শতাংশ সময় বরবাদ হয়েছে সোনিয়ার দলের সাংসদদের বাধায়। লোকসভায় প্রতি ঘণ্টায় খরচ হয় ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। রাজ্যসভায় ঘণ্টা প্রতি খরচ হয় ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। যদি পুরো বাদল অধিবেশন কংগ্রেস সাংসদদের বাধায় অচল হয় তবে দেশের কর দাতাদের মোট ২৬০ কোটি টাকা নষ্ট হবে। এর মধ্যে লোকসভায় বিনা কাজে খরচ হবে ১৬২ কোটি টাকা এবং রাজ্যসভায় ৯৮ কোটি টাকা। একবার ভেবে দেখুনতো, দেশের মানুষের দেওয়া করের টাকা এইভাবে নয় ছয় করার অধিকার কী ভোটদাতারা কংগ্রেসী সাংসদদের দিয়েছেন?

সোনিয়া এবং রাহুল গান্ধী ঘোষণা করেছেন, তাঁদের দলের দাবি না মানলে সংসদের বাদল অধিবেশন চলতে দেওয়া হবে না। অথচ এই অধিবেশনে ১১টি আগেই পেশ করা বিল এবং ৯টি নয়া বিল নিয়ে আলোচনা বা বিতর্ক হওয়ার কথা। এই সব গুরুত্বপূর্ণ বিলের মধ্যে আছে, জমি বিল, আর্থিকভাবে দুর্বল ও অনগ্রসর জাতিগুলির উপর অত্যাচার বন্ধের জন্য এস সি এস টি প্রিভেনসন অফ অ্যাট্রোসিটিজ অ্যমেন্ডমেন্ট বিল, প্রতারণায় উদ্দেশ্যে দেওয়া চেক নাকচ হলে চেকদাতার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির সুপারিশ করে আনা দ্য নিগোসিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্টস্ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, সরকারি বা আধাসরকারি ক্ষেত্রে দুর্নীতির পর্দা ফাঁস করা ব্যক্তিদের সুরক্ষা দিতে হুইসলব্লোয়ারস প্রটেকসন বিল। এছাড়া আছে দুর্নীতি দমন বিল, মেন্টাল হেলথ কেয়ার বিল, শিশু শ্রমিক আইন সংশোধনী বিল, জুভেনাইল জাস্টিস অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, নির্মাণ শিল্পের অসাধু প্রমোটারদের শায়েস্তা করতে আনা রিয়েল এস্টেট বিল ইত্যাদি। এখন প্রমোটাররা ক্রেতাদের কাছ থেকে হাজার বর্গফুটের দাম নিয়ে বাস্তবে দেয় মাত্র ৭০০ বর্গফুট। দেশজুড়ে এই প্রতারণা অবাধে চলছে। এই প্রতারণা রুখতেই বিলটি সংসদে আনা হয়। লোকসভায় আগেই বিলটি অনুমোদিত হয়েছে। রাজ্যসভায় অনুমোদনের জন্য বিলটি পেশ করাও হয়েছে। কিন্তু কংগ্রেসের হল্লাবাজদের জন্য রাজ্যসভার অনুমোদন স্থগিত হয়েছে। এতে কোন বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করছে কংগ্রেস?

সংসদে বাদল অধিবেশন শুরু হয়েছে ২১ জুলাই। অধিবেশনের প্রথম দিনেই রাহুল হুঙ্কার দেন যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৫৬ ইঞ্চি বুকের ছাতিকে কংগ্রেস সাড়ে ছয় ইঞ্চি করে দেবে। মহাভারতের ধর্মযুদ্ধের আগে কৌরব যুবরাজ দুর্যোধন সর্বসমক্ষে পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে এমনই দম্ভ প্রকাশ করেছিলেন। পরিণামে কৌরববংশ ধ্বংস হয়। কংগ্রেসের যুবরাজ রাহুলও দুর্যোধনের মতোই মাত্রাতিরিক্ত দম্ভ প্রকাশ করছেন। কারণ, রাহুল মহাভারত পাঠ করেননি। অথবা করলেও নীতি শিক্ষাটি নেননি। নিলে দুর্যোধন তাঁর আদর্শ পুরুষ হতেন না। রাহুল গান্ধীর অপরিণামদর্শিতার জন্য ভারতের মাটি থেকে জাতীয় কংগ্রেস চিরকালের জন্য মুছে যাবে।

রাহুল কাদা ছোঁড়ার সস্তা রাজনীতি করছেন। তিনি মন্তব্য করেছেন, ললিত মোদীকে ভিসা পেতে সাহায্য করার বিনিময়ে সুষমা স্বরাজ টাকা পেয়েছেন কিনা সে ব্যাপারে তদন্ত করা হোক। মানবতার খাতিরে তিনি ললিতকে সাহায্য করেছেন এই দাবির বিশ্বাসযোগ্যতাও প্রমাণ করা হোক। নিঃসন্দেহে এমন মন্তব্য বিদেশমন্ত্রীর পক্ষে মানহানিকর। রাহুলের বিরুদ্ধে আদালতে মানহানির মামলা দায়ের করা উচিত। ২৪৫ সদস্যের রাজ্যসভায় কংগ্রেস সদস্য আছেন ৬৮ জন। যতই মাস গড়াবে ততই কংগ্রেস সদস্যের সংখ্যা কমবে। বহু রাজ্যে ক্ষমতায় থাকার সুবাদে বিজেপির শক্তি রাজ্যসভায় ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে। সোজা হিসেবে, ২০১৯ সালে রাজ্যসভায় বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হবে। তখন রাহুলের এই হল্লাবাজি নীতি অচল হতে বাধ্য। সংসদে গঠনমূলক বিতর্কে অনভ্যস্ত কংগ্রেসী সাংসদদের সামনে তখন বিকল্প পথ খোলা থাকবে না। রাহুলের বোঝা দরকার যে সংসদ অচল করার নীতি অনুসরণ করে চললে আখেরে ক্ষতি হবে সাধারণ মানুষেরই। বিজেপির নয়। দেশের ভোটদাতারা কংগ্রেসকে ক্ষমা করবেন না। তাতে কংগ্রেস ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ধ্বংস হবে। লাভ হবে বিজেপি-র। যেমন, কুরুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধে শক্তি কম থাকা সত্ত্বেও পাণ্ডবরাই বিজয়ী হন। কুরুবংশ ধ্বংস হয়। ■

লোকসভা-রাজ্যসভা টিভি চাইল্ড লক করুন

মাননীয় সাংসদগণ
লোকসভা ও রাজ্যসভা
নয়াদিল্লী

আজকাল ইন্টারনেটে হোয়াটস অ্যাপের যুগ। এক সঙ্গে হাজার হাজার মানুষকে চিঠি পাঠানো যায়। চিঠিও কপি করে অনেকেই দেওয়া যায়। কিন্তু আমি আধুনিক কায়দা মেনে সবাইকে এক চিঠিতে সম্বোধন করলাম। মাননীয় সাংসদরা আমাকে মাফ করবেন। কোটি কোটি ভোটার আপনাদের জিতিয়ে যে বাড়িতে পাঠায় সেখানেই গ্রুপ চিঠি পাঠালাম। তবে জানি সবাই পাবেন না। কারণ, কেউ আছেন জেলে, কেউ সিনেমার শ্যুটিংয়ে, কেউ আবার এমনিই এমনিই যেতে ভালো লাগে না বলে যান না। লোকসভা, রাজ্যসভা মিলিয়ে ভারতে সাংসদ সংখ্যা প্রায় ৮০০। ধরে নেওয়া যাক তাঁদের ৫০০ জন নিয়মিত। সংখ্যাটা এর কমও হতে পারে। যাইহোক, যাঁরা নিয়মিত যান না তাঁরা বরং ভালো। অন্তত প্রতিদিনের তাঁদের পিছনের খরচটুকু কমে। যাক আসল কথায় আসি।

প্রথম দিন মেরে কেটে ৭২ মিনিটে ছুটি। দ্বিতীয় দিন ৬৩ মিনিট। তৃতীয় দিন ৩৩ মিনিট। আর চতুর্থ দিনে চার মিনিটেই ছুটি। পাঠশালা বা প্রাথমিক স্কুল নয়, এটা ভারতীয় গণতন্ত্রের পীঠস্থান সংসদ ভবনের গল্প। যে সংসদকে দেবতা জ্ঞানে প্রথমবার প্রবেশ করার সময় নতজানু হয়ে প্রণাম করেছিলেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

এখন তো টিভিতে আপনারা কী করেন সব দেখা যায়। আর সেটা যেন উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রদের হুজ্জুতি। আর তা ঠেকাতে স্পিকার দিদিমণির নাস্তানাবুদ অবস্থা। মাননীয় সাংসদগণ আপনাদের একটা তথ্য জানিয়ে রাখি। আজকাল বাড়িতে বাড়িতে ওই দুটি চ্যানেল চালানো বন্ধ করা হয়েছে। কেউ কেউ চাইল্ড লক করে রেখেছে। কারণ, ছোটরা যদি একবার দেখে মাস্টারমশাইদের মতো দেখতে লোকগুলো ক্লাসরুমে তাদের থেকেও বেশি দুষ্টুমি করছে তবে ছেলেপিলেরা মাথায় ওঠে যাবে। সুমিত্রা মহাজন তাই ঠিক করেছেন ছেলেমেয়েরা দুষ্টুমি করলেই ছুটির ঘণ্টা বাজিয়ে দেবেন। নে বাবা যা সস্তার ক্যান্টিনে দুটি খেয়ে যেথা খুশি সেথা যা। একে অপরকে সাংবাদিক সম্মেলন করে গালমন্দ করা ক্লাসরুমে এটা হতে দেব না। কিন্তু তাতেও কি তিনি পারছেন। এ তো আর পাঠশালা নয়, দেশের সংসদ। গার্জেন কলেরও সুযোগ নেই। একদিন তাই লোকে যাতে দেখতে না পায় সেজন্য টিভির সুইচই বন্ধ করে দিয়েছিলেন। সারা দেশে লোকসভা টিভির সম্প্রচার বন্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু টিভি বন্ধ করে দিলে, ছুটির ঘণ্টা বাজিয়ে দিলেই তো হলো না। সংসদে অসময়ে ছুটি দেওয়া মানে কোটি কোটি টাকার অপচয়। তার পরিমাণ কতটা আপনাদের খেয়াল আছে?

তিন বছর আগে কংগ্রেস যখন ক্ষমতায় তখন বিরোধী আসনে থাকা বিজেপির হট্টগোলে সংসদের অধিবেশন ভেস্তে যাওয়ার পর তখনকার সংসদীয় মন্ত্রী কংগ্রেসের পবন বনশল একটি হিসেব প্রকাশ করেছিলেন। বলেছিলেন, দিনে ছ' ঘণ্টা করে বছরে গড়ে ৮০ দিন অধিবেশন চলে সংসদে। যদি সংসদের পিছনে হওয়া সমস্ত খরচ একত্র করা হয়, তা হলে প্রতি মিনিট অধিবেশন চালাতে সেই খরচ দাঁড়ায় আড়াই লক্ষ টাকা! আর লোকসভা সচিবালয়ের হিসেব বলছে, আনুষঙ্গিক সমস্ত খরচপত্র বাদ দিয়ে শুধু সংসদ চালানোর খরচটাই যদি ধরা হয়— প্রতি মিনিটে তা প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা! এই চিঠি লেখার সময় পর্যন্ত সদের বাদল অধিবেশনে প্রথম সপ্তাহে কাজ হয়েছে ৬ শতাংশ। বাকি ৯৪ শতাংশ শুধু অপচয়। মাত্র ১৮ দিনের এই অধিবেশনের প্রথম চারদিনে যদি এই রেজাল্ট হয় তবে বাকিটা কী হবে কে জানে!

স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠছে, করদাতাদের কোটি কোটি টাকা অপচয় করে এ ভাবে স্রেফ হল্লা আর গোলমাল করে সময় কাটানোর সিদ্ধান্ত কতটা অর্থবহ? অধিবেশন ভণ্ডুলই যদি হবে তবে নিয়ম করে সংসদ খোলার দরকার কী?

সংসদে রোজ এক গুচ্ছ আলোচনার নোটিস জমা পড়ে দুই কক্ষের স্পিকারদের কাছে। কিন্তু তারপর আর কেউ আলোচনাই করেন না! খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও সাংসদদের কর্মশালার অনুষ্ঠানে বলেছেন, ''সাংসদদের উপরে মানুষের অনেক প্রত্যাশা। সেই প্রত্যাশা পূরণে আমাদের কাজ করা উচিত। গোটা পৃথিবী কিন্তু নজর রাখছে আমাদের উপর।''

কিন্তু কে শোনে কার কথা? সরকার যেহেতু বিজেপির সুতরাং ভণ্ডুল করতেই হবে? আরে বাবা সরকার কী চাইছে সেটা শুনে মতামত দিন না। জোর থাকলে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বিরোধিতা করুন। তা না করে হট্টোগোল করে কী লাভ? সবে তো এক বছর হয়েছে সরকারটার। যে সব দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে তার পাল্টা বক্তব্যটা শুনুন। তদন্ত হতে দিন।

সেসব না করে গোলমাল পাকালে স্পিকার যদি গার্জেন কল করে তখন বুঝবেন। মনে রাখবেন জনগণই আপনাদের গার্জিয়ান।

কিন্তু সে তো আর হওয়ার নয়। তবে মল্লযুদ্ধই চলুক। আমরা বরং অ্যাডাল্ট চ্যানেল হিসেবে লোকসভা রাজ্যসভা টিভিকে চাইল্ড লক করে রাখব।

— সুন্দর মৌলিক

পাকিস্তানের সঙ্গে আপাতত সংঘর্ষের সম্পর্কই চলতে থাকুক

দিব্যজ্যোতি চৌধুরী

একদিকে শান্তি-সৌহার্দ্যের বার্তা আর অন্যদিকে পাল্টা মার— এটাই পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক হওয়া উচিত। পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক এছাড়া আর যে কিছু হতে পারে না তা আরও একবার প্রমাণিত হলো। অনেককাল ধরেই কাশ্মীর আন্তর্জাতিক আগ্রহের বিষয়বস্তু। কাজেই সীমান্তে শান্তি ফিরিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক তৈরি করতে ভারত যে সদা সচেষ্ট এই বার্তা লাগাতার বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিতে হবে। তবে সে কাজ ভারতের পক্ষে একতরফাভাবে কখনও সম্ভব নয়। যতবারই ভারত পাকিস্তানকে সৌহার্দ্যের বার্তা দিয়েছে ততবারই পাকিস্তান ভারতকে নির্মম প্রত্যাঘাত করে বুঝিয়ে দিয়েছে যে ভারতের এটা নিষ্ফল প্রয়াস ছাড়া আর কিছুই নয়। পাকিস্তান বরাবর ভারতকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বার্তা দিয়েছে যে কাশ্মীরের দাবিই তাদের ভারতের সঙ্গে আলোচনার একমাত্র বিষয় হতে পারে। কাজেই আলোচনার টেবিলে দু'দেশের মধ্যে সমস্যার সমাধান যে প্রায় অসম্ভব সেটা বারংবার প্রমাণিত। বস্তুত ভারত-পাক দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের আগেই পাকিস্তান ভারতের উপর এতবড় আঘাত হানবে যে ভারতের পক্ষে শান্তির বার্তা নিয়ে আর এক পাও এগোনো সম্ভব হবে না।

সম্প্রতি রাশিয়ায় ব্রিকস্ সম্মেলনের ফাঁকে পাক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দীর্ঘ নীরবতার পর দ্বিপাক্ষিক আলোচনা ফের কীভাবে শুরু করা যায়, তার একটা সম্ভাব্য রূপরেখাও তৈরি হয়েছিল। কিন্তু বৈঠকের অব্যবহিত পরেই পাকিস্তানের নিরাপত্তা উপদেষ্টা সরতাজ আজিজ এক বিবৃতিতে বলেন যে কাশ্মীর প্রসঙ্গ ছাড়া কোনো দ্বিপাক্ষিক আলোচনাই সম্ভব নয়। অভ্যন্তরীণ রাজনীতির বাধ্যবাধকতা থেকেই এই বিবৃতি বলে ভারত এই বক্তব্যকে গুরুত্ব না দিলেও বিগত কয়েকদিন যেভাবে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে তাতে মোদী সরকারের পক্ষে শান্তির বাণী আওড়ানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। জম্মু-কাশ্মীরের আখনুর সেক্টরে সংঘর্ষবিরতি চুক্তিকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে সমানে গুলি চালাচ্ছে পাকসেনা, যাতে এক জওয়ান-সহ এক নিরীহ মহিলা গ্রামবাসী মারা গিয়েছে। এ নিয়ে চলতি মাসের মধ্যেই পাকিস্তান ন'বার সংঘর্ষবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করলো। অবশ্যম্ভাবীভাবেই ভারত তার যোগ্য জবাব হিসেবে পাল্টা আঘাত হানতে বাধ্য হয়েছে। ফলস্বরূপ অতীতের পথেই ভারত-পাক শান্তির সোনালি আশা অঙ্কুরেই নষ্ট হয়েছে। আসলে একটা ব্যর্থ প্রচেষ্টা জেনেও নরেন্দ্র মোদী আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতায় ভারতের পূর্বতন প্রধানমন্ত্রীদের পথে আরও একবার হাঁটতে একপ্রকার বাধ্য হলেন।

> “পাকিস্তানকে অযথা বেশি গুরুত্ব দেবার অর্থই নেই। এমন একটা দেশকে নিয়ে কেন আমরা অকারণে শোরগোল তুলছি? ভারত-পাক বৈরিতার অবসান পাকিস্তানের ইচ্ছেয় হবে না, হবে দু'দেশের শান্তিকামী জনগণের ইচ্ছায়।”

অটলবিহারী বাজপেয়ী ১৯৭৭ সালে জনতাপার্টির সরকারের বিদেশমন্ত্রী হিসেবে পাকিস্তানের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়েছিলেন। পরবর্তীকালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবেও সৌহার্দ্যের একটা অসম্ভব প্রয়াস চালিয়েছিলেন যার পরিণাম কার্গিল যুদ্ধে পর্যবসিত হয়েছিল। ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মনমোহন সিংও পাক রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীকে ভারতের আন্তরিকতা বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন। যখন পাকসেনারা ভারতের সীমানায় ঢুকে জওয়ানদের মুণ্ডু কেটে নিয়ে গেছে সে সময়ও মনমোহনজী মৈত্রীর বার্তা দিতে পাক ক্রিকেট দলকে ভারতে আমন্ত্রণ জানিয়ে ভারতীয় দলের সঙ্গে তাদের খেলিয়েছেন। পাকিস্তানকে তুষ্ট করতে এমন লজ্জাজনক আচরণের পরও কি আমরা পাকিস্তানের কাছ থেকে ইতিবাচক কোনো সাড়া পেয়েছি?

আরও একটি কারণে ভারত-পাক বন্ধুত্ব কখনই সম্ভব নয়। তা হলো, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ঐতিহাসিক ভুল বিদেশনীতি। পাকিস্তানের কবল থেকে বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে গিয়ে তিনি পাকিস্তানকে

ভারতের স্থায়ী শত্রুদেশে পরিণত করেছেন। অন্যদিকে বাংলাদেশও প্রতিদানে কখনও ভারতের মিত্র হয়ে ওঠেনি। বর্তমানে বঙ্গবন্ধু মুজিবের কন্যা শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হবার সুবাদে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হলেও, হাসিনা পরবর্তী বাংলাদেশের সঙ্গে সে সম্পর্ক অটুট থাকবে সে নিশ্চয়তা কোথায়? তাছাড়া এখনও ভারতের বুকে নাশকতামূলক কাজ কারবারের একটি প্রধান উৎপত্তিস্থল যে বাংলাদেশের মাটি, তার ভুরিভুরি উদাহরণ সাম্প্রতিককালেই রয়েছে। এরকম পরিস্থিতিতে পাকিস্তান সম্পর্কে ভারতের অবস্থান কী হওয়া উচিত? বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের পাকিস্তানের বিষয়ে চিন্তা-ভাবনার পরিবর্তন করতে হবে। এখানে একটি ব্যাপারে আমাদের সচেতন হতে হবে। যার জন্ম 'ঘৃণা ও রক্তপাতের' মধ্যে ঘটেছে সেই পাকিস্তান সবসময়ই আমাদের উপর চাপ সৃষ্টি করবে। তাই পাকিস্তানকে আরও বেশি সুযোগ-সুবিধা দিয়ে তুষ্ট করা ভারতের পক্ষে আহাম্মকিই বলা যায়। অতীতে রাজাজী এবং জয়প্রকাশ নারায়ণ এধরনের প্রচারও করেছেন যে, পাকিস্তানের সঙ্গে যে কোনো মূল্যে শান্তি স্থাপন করতে হবে, প্রয়োজনে কাশ্মীরকে তাদের হাতে সঁপে দিয়েও চেষ্টা করতে হবে যাতে চীনের বিরুদ্ধে একটি যুক্তমোর্চা গঠন করা যায়। এরকম চিন্তা ভাবনার প্রতিফলন কংগ্রেস সরকারের আচরণেও প্রকাশ প্রায়। কিন্তু এরদ্বারা কি সমস্যার সমাধান হবে? পিঠ চাপড়ে আর বহু সুযোগ-সুবিধা বর্ষণ করে ওদের মন জয় করার অসংখ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। ওদের তুষ্ট করার জন্য আমরা কাশ্মীরের এক-তৃতীয়াংশ ওদের সমর্পণ করেছি। আমাদের অর্থে নির্মিত খালের জলও আমরা ওদের দিয়েছি। এর পরও আমরা ওদের প্রচুর অর্থ দিয়েছি। কিন্তু তার প্রতিদানে তারা আমাদের কী দিয়েছে?

দেশভাগের শর্ত অনুযায়ী হিন্দুরা যে স্থাবর সম্পত্তি ফেলে চলে এসেছেন তার ক্ষতিপূরণ ওদের দেবার কথা ছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত একটি পয়সাও আমরা পাইনি। শুধু পেয়েছি নির্ভেজাল সন্ত্রাস আর প্রাণঘাতী বিস্ফোরণ ও জঙ্গিহানা। স্বভাবতই অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে বর্তমান বিজেপি সরকার তাদেরকে আর কোনো বিশেষ ছাড় দিতে চায় না। কেননা মোদী সরকার বিলক্ষণ জানে যে কাশ্মীরের পর পাকিস্তানের লক্ষ্য অসম আর বাংলা। তাই আগে থেকেই সরকার এই দুটি রাজ্যের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া শুরু করেছে।

বস্তুত এখন এমন একটা সময় এসেছে যখন ভারতকে জোর সওয়াল করে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যে পাকিস্তান নামে কোনো দেশের অবস্থান নেই, যা আছে তা হলো আন্তর্জাতিক মুসলমান সন্ত্রাসবাদীদের জন্য এবং তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি ভূখণ্ড। এর কোনো নির্ভরযোগ্য সরকার নেই, নির্ভরযোগ্য আইন বা সংবিধান বলেও কিছু নেই। এটা একটা ব্যর্থ রাষ্ট্র যা সরকারবিহীন, রাষ্ট্রপতিবিহীন এবং সম্পূর্ণভাবে মুসলমান সন্ত্রাসবাদীদের নিয়ে গঠিত সেনাবাহিনী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বস্তুত এটি একটি ভাড়াটে ভূখণ্ড যার হর্তাকর্তা হলো ভাড়াটে সেনাবাহিনী। দেশটার অর্থনীতি বলেও কিছু নেই। সৌদি আরব, আমেরিকা আর চীনের অর্থে পাকিস্তান চলে।

আমেরিকা আক্রমণকারী লাদেনের আশ্রয়দাতা পাকিস্তানকে আমেরিকা কোনো শাস্তি দিয়েছে কী? দেয়নি, কারণ আমেরিকা কখনোই পাকিস্তানকে রাষ্ট্র বলে মনে করে না। অর্থের বিনিময়ে তারা এই ভাড়াটে ভূখণ্ডের জমিকে নিজেদের নিরাপত্তার কারণে ব্যবহার করে। আমেরিকা মূলত পাকিস্তানের জমিকে আফগানিস্তানে সামরিক অভিযান চালানোর জন্য ভাড়া হিসেবে অর্থ দেয়। পাকিস্তানকে ওয়াশিংটন তাদের ট্যাঙ্ক, যুদ্ধাস্ত্র বহনকারী গাড়ি রাখার 'পার্কিং স্পেস' হিসেবে ব্যবহার করছে। এর মাশুল গুনতে হচ্ছে ভারতকে। মার্কিন অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সন্ত্রাসবাদীরা ভারতে হামলা চালাচ্ছে। একইভাবে চীন ভারতের ভূখণ্ড অবৈধভাবে গ্রাস করতে এবং এশিয়া মহাদেশে তাদের আগ্রাসন জারি রাখতেই পাকিস্তানকে ব্যবহার করেছে। চীন-পাকিস্তানের নিরাপত্তা সহযোগিতা গভীর। চীনের তৈরি 'ড্রোন'-সহ বহু চীনা অস্ত্র ও উপকরণ যে পাকবাহিনী ব্যবহার করে তার প্রমাণ ভারতীয় গোয়েন্দারা দিয়েছেন। আর পাকিস্তানকে মদতদাতার শীর্ষে রয়েছে সৌদি আরব-সহ আরব দুনিয়া। বিশ্বজুড়ে মুসলমান সাম্রাজ্য স্থাপনের মূল হোতা তারাই। শুধু পাকিস্তান কেন, ইউরোপ ও আফ্রিকার নানা দেশে তারা অস্ত্র ও অর্থ সরবরাহ করে। সৌদির বিপুল অর্থ সাহায্য-সহ লক্ষ লক্ষ পাকিস্তানি আরব দুনিয়ায় কাজ করে প্রচুর অর্থ দেশে পাঠায় যা থেকে পাকিস্তান রমরমিয়ে চলে। সৌদির পরিকল্পনাতেই পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির পালাবদল হয়। সৌদি আরবই নওয়াজ শরিফকে একসময় নির্বাসনে পাঠিয়েছিল, আবার তাদের ইচ্ছাতেই মুশারফ এবং আমেরিকার মতামতকে নস্যাৎ করে তিনি পাক-রাজনীতিতে পুনরায় প্রবেশ করেছেন।

তাই পাকিস্তানকে অযথা বেশি গুরুত্ব দেবার অর্থই নেই। এমন একটা দেশকে নিয়ে কেন আমরা অকারণে শোরগোল তুলছি? ভারত-পাক বৈরিতার অবসান পাকিস্তানের ইচ্ছেয় হবে না, হবে দু'দেশের শান্তিকামী জনগণের ইচ্ছায়। এ ব্যাপারে রাষ্ট্রসঙ্ঘের দিক থেকে যে বিশেষ কিছু সহায়তা মিলবে না তা জোর দিয়ে বলা যায়। কেননা সরষের মধ্যেই ভূত লুকিয়ে আছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের মূল দুই শক্তি— আমেরিকা ও চীন সরাসরি পাকিস্তানের মদতদাতা। তাই এতদিন পাকিস্তান ভারতের ক্ষেত্রে যে ভূমিকা নিয়ে এসেছে, সেই ভূমিকাই এবার ভারতের নেওয়া উচিত। মুখে ভ্রাতৃত্বের বুলি আউড়ে, ভেতরে ভেতরে আক্রমণ-প্রতিআক্রমণ করে পাকিস্তানকে জেরবার করে তোলাই ভারতের একমাত্র নীতি হওয়া উচিত অন্তত ততদিন, যতদিন না পাকিস্তানকে নিয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতির সমীকরণে কোনো পরিবর্তন হয়। আর প্রয়োজন চীন ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এশিয়ার অ-মুসলমান রাষ্ট্রগুলিকে সংগঠিত করে ভারতের নেতৃত্ব দেওয়া, যে কাজটি নরেন্দ্র মোদী ইতিমধ্যেই সেরে ফেলেছেন। ■

পশ্চিমবঙ্গে মানবাধিকার ও তার ভবিষ্যৎ

হেনস্থার শিকার প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার মীরা পাণ্ডে।

ভাস্কর ভট্টাচার্য

রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রধান শর্ত রাষ্ট্রের জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা। গণতন্ত্রের মূল মন্ত্র মানুষের নিবাসযোগ্য এমন এক সমাজব্যবস্থা যেখানে প্রতিটি মানুষ তার প্রাপ্য ন্যায্য অধিকার নিয়ে তার দ্বারা স্বীকৃত সরকারের মাধ্যমে সাংবিধানিক পরিকাঠামোর মধ্যে থেকে উন্নততর জীবনের লক্ষ্যে নিজেদের এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে যে সমস্ত সাংবিধানিক ব্যবস্থাকে স্ব-শাসনের আওতায় আনা হয়েছে তার মধ্যে এক প্রধান স্তম্ভ মানবাধিকার কমিশন। আন্তর্জাতিক মহলের মস্তিষ্কপ্রসূত এই মানবাধিকার কমিশন সারা বিশ্বে আজ এক বিশেষ মর্যাদা পায় গণতন্ত্রের প্রধান পরিকাঠামো হিসাবে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কমিশনের মাধ্যমে। ভারতে 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন (National Human Rights Act-1993) তৈরি ও প্রণয়ন হয় ১৯৯৩ সালে ২৮ সেপ্টেম্বর অধ্যাদেশের মাধ্যমে (Under Human Rights Ordinance)।

জাতীয় মানবাধিকার তৈরি হয় ১২ অক্টোবর ১৯৯৩ সালে। তখন থেকে সাধারণ মানুষ এই আইনের দ্বারা পরিচালিত মানবাধিকার কমিশনের নিকট যাবতীয় অভিযোগ, যা মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারণ, তা প্রকাশ করে আসছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সমস্ত বিশ্ব যে ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দিয়ে আসছে, সেই গণতন্ত্রের অন্যতম পরিকাঠামোকে সু-পরিকল্পিতভাবে,

বিশ্ব যে ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দিয়ে আসছে, সেই গণতন্ত্রের অন্যতম পরিকাঠামোকে সু-পরিকল্পিতভাবে, রাজনৈতিক ক্ষমতাকে ব্যবহার করে ধ্বংস করার এক ঘৃণ্য চক্রান্তে লিপ্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার। মানুষের জীবন সংক্রান্ত, সাম্যের অধিকার সংক্রান্ত, স্বাধীনতা সংক্রান্ত এবং ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সম্মান সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় এই কমিশনের অন্তর্গত। মানুষ আজ পশ্চিমবঙ্গে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত।

রাজনৈতিক ক্ষমতাকে ব্যবহার করে ধ্বংস করার এক ঘৃণ্য চক্রান্তে লিপ্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার। মানুষের জীবন সংক্রান্ত, সাম্যের অধিকার সংক্রান্ত, স্বাধীনতা সংক্রান্ত এবং ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সম্মান সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় এই কমিশনের অন্তর্গত। মানুষ আজ পশ্চিমবঙ্গে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত। আইনের শাসন ও ন্যায্য বিচার পাবার অধিকার থেকে বঞ্চিত। কারণ সরকারের পুলিশ প্রশাসন ও সরকারি উকিল শুধু দলের রং দেখে (শাসক) তাদের দায়িত্ব পালন করে চলেছে।

সরকারি হাসপাতালে মানুষের জন্য শয্যা (বেড) পাওয়া যায় না। মাটিতে শুতে হয়, অথচ কুকুরের ডায়ালেসিসের জন্য (কোনো মহান নেতার কুকুর) শাসকদলের চাপের কাছে হাসপাতালের সুপারকে মাথা নোয়াতে হয়, যা সারা পৃথিবীতে দুর্লভ।

অভিযোগকারীকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে জেলে ঢোকানো হচ্ছে আর অভিযুক্ত শাসকদলের ছত্রছায়ায় থেকে অবাধে বিচরণের ছাড়পত্র পেয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি সাধারণ মানুষের অধিকার আছে তাদের সন্তানদের শিক্ষিত করে সমাজের উপযোগী করে গড়ে তোলার। কিন্তু শিক্ষাঙ্গনে সরকারি ছাত্র-প্রতিনিধিদের দাপটে শিক্ষার অবমূল্যায়ন প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে, যা শিক্ষাজগৎকে শুধু কলুষিতই

মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানের পদ ছেড়ে বেরিয়ে আসছেন অশোক কুমার গাঙ্গুলী।

করছে না, শিক্ষার মান আজ তলানিতে ঠেকেছে। ন্যূনতম মূল্যবোধ আজ শিক্ষিতের মধ্যেও নেই। যার জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি জুনিয়র ডাক্তাররা সরকারি হাসপাতালে চাকরি করে, কমিশনের লোভে রোগীকে রক্ত পরীক্ষা করানোর জন্য বাইরের প্যাথলজিক্যাল সেন্টারে পাঠাচ্ছে যেখানে খোঁজ নিয়ে দেখা যাচ্ছে ল্যাবের পরিবর্তে খাটাল আছে। রোগীর যথাযথ পরিষেবার দিকে কারোর নজর নেই, নেই সরকারি পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা। যদিও প্রতিটি রোগীর অধিকার আছে সরকারি হাসপাতালে ন্যায্য পরিষেবা পাবার।

বছর দেড়েক আগে পশ্চিমবঙ্গে মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন সুপ্রিমকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি শ্রী অশোক গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর সময়ে সরকারের অ-মানবাধিকার সুলভ আচরণের জন্য সাধারণ মানুষ সহায়তা পেতেন। অধ্যাপক অম্বিকেশ মহাপাত্রকে কার্টুন কাণ্ডে পুলিশের অন্যায় হেনস্থার কারণে একদিন লকআপে রাখার জন্য অশোকবাবু রাজ্য সরকারকে জরিমানা ধার্য করেন। শিলাদিত্য নামের এক ব্যক্তিকে মাওবাদী তকমা দিয়ে অন্যায়ভাবে জেলে ঢোকানোর জন্য অশোক গাঙ্গুলী মহাশয় সরকারকে জরিমানা করেন। কিন্তু কোনও ক্ষেত্রেই সরকার তা গ্রাহ্য করেনি। উলটে মাননীয় চেয়ারম্যানের অন্যায়ভাবে চরিত্রহনন করে তাঁকে অবসর নিতে বাধ্য করান মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর সরকার। তার জায়গায় প্রাক্তন পুলিশ কর্তা নপরাজিত মুখার্জী, যিনি মুখ্যমন্ত্রীর আজ্ঞাবহ, তাঁকে বসানো হয়েছে যা সংবিধান বিরোধী। ওই পদে শুধুমাত্র হাইকোর্ট বা সুপ্রিমকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিই বসতে পারেন। উপরন্তু এই নপরাজিত মুখার্জী পদাধিকারে থাকাকালীন লেখক নিজে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। কামদুনি কাণ্ডে, নির্যাতিতার কাকিমার অপমৃত্যুর জন্য, যা এখন ফাইল চাপা আছে।

মাননীয়া প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার মীরা পাণ্ডেকে দেখেছি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অপশাসনের বিরুদ্ধে মাথা নত না করতে। ফলে তাঁকে হেনস্থার স্বীকার হতে হয়।

নপরাজিতবাবু মানবাধিকার কমিশনের মতো এক নিরপেক্ষ, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার প্রধান হয়েও কিছুদিন আগে বর্ধমানে সরকারি পর্যালোচনা সভায় দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রীর গুণগান করলেন ও মিথ্যা পরিসংখ্যান দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলেন। এ এক বিরল দৃষ্টান্ত সাংবিধানিক পদের অবমাননার।

এই রাজ্যে নারী নির্যাতন আজ এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, নিরীহ ছোট-মেয়েরাও এখন নির্যাতন ও অপহরণের শিকার হচ্ছে। তাদের পরিবার-পরিজনকে ঘরছাড়া হতে হচ্ছে, রাজ্য ছাড়া হতে হচ্ছে, এই নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাতে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের এক চরম নিদর্শন স্থাপন করেছে বর্তমান সরকার। 'মা, মাটি, মানুষ' যে শুধু ভোটে জেতার একটা স্লোগান তা আপামর পশ্চিমবঙ্গবাসী বুঝতে পেরেছে।

এই কার্টুনের জন্যই অম্বিকেশ মহাপাত্রকে হাজতবাস করতে হয়। বাঁ দিকে অম্বিকেশবাবু।

পার্কস্ট্রিটের ধর্ষিতা সু-জেটকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দেন মুখ্যমন্ত্রী। সত্য বলার জন্য পুলিশ আধিকারিক দময়ন্তী সেনকে বদলির নির্দেশ দেওয়া হয়। কামদুনির নির্যাতিতার পাশে দাঁড়িয়ে মৌসুমী কয়াল ও টুম্পা কয়াল নামে দুই প্রতিবাদী কণ্ঠকে চাপতে তাদের মাওবাদী আখ্যা দেওয়া হয়।

মধ্যমগ্রামের ধর্ষিতাকে পুড়িয়ে মারার পর তার পরিবার কোনও বিচার না পেয়ে অসহায়ভাবে রাজ্যছাড়া হতে বাধ্য হয়।

উত্তর দিনাজপুরে এক ছাত্রী গণধর্ষিতা হওয়ার পর বাড়ি ফিরতে পারেনি। পরে

শিলিগুড়ি থেকে পড়াশোনা করে।

মধ্যমগ্রামে ছেলের গলায় অস্ত্রঠেকিয়ে 'মা'কে ধর্ষণ করা হয়। মামলা তোলার চাপ সামলাতে না পেরে নির্যাতিতা এখন বাপের বাড়ি।

চিৎপুর ইয়ার্ডের অন্তঃসত্ত্বা মহিলা ধর্ষিতা হয়ে, হুমকির ভয়ে এখন বাপের বাড়িতে আশ্রিতা।

হলদিবাড়িতে এক কলেজ ছাত্রীকে চাকরি দেওয়ার লোভ দেখিয়ে তৃণমূলের এক স্থানীয় নেতা ধর্ষণ করে। অভাগী দু'মাস বাড়ি ফিরতে পারেনি। মালদার রতুয়া পুলিশের অন্তর্গত এলাকায় গত ১৪ জুলাই, পূজা ছেত্রী নামে ১৭ বৎসরের এক বালিকাকে সাত্তার আলি খান, প্রেম আলি খান নামে দুই দুষ্কৃতী অপহরণ করে। FIR হওয়া সত্ত্বেও পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি।

মাওবাদী তক্মা পাওয়া শিলাদিত্য চৌধুরী।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ জানানো হয়েছে। আর বর্তমান বীরভুমের সাত্তোরের এক নির্যাতিতা গৃহবধূ, যাকে প্রশাসনের রক্ষকরাই নির্যাতন করে। তার দৃঢ় মানসিকতার কাছে হার মেনে তাকে 'ভয়ঙ্কর' ও 'বিপজ্জনক' বলে আখ্যা দেয় সরকারি আইনজীবী। তার পুরো পরিবার আজ কারাগারের অন্তরালে, আর অভিযুক্তরা সরকারি মানবাধিকারের ধ্বজা ধরে বাহিরে ঘুরছে।

এই সরকার যদি আর একটা মেয়াদ থাকে, তাহলে সাধারণ মানুষকে আবার জঙ্গলের রাজত্বে ফিরে যেতে হবে। যার শুরু আমরা এখন থেকেই দেখতে পাচ্ছি। পরিশেষে বলতে চাই, পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশনে সত্বর চেয়ারম্যান নিযুক্ত করতে হবে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে বার বার আবেদন করেও সাড়া পাওয়া যায়নি। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত এই বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যাতে গণতন্ত্রের এই পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী হয় সাধারণ মানুষের জন্য।

(লেখক একজন আইনজীবী)

১৯৪৮ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

প্রতি সংখ্যা ১০ টাকা

স্বস্তিকা

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০টাকা

অবহিত হবার এবং অবগত করার নির্ভরযোগ্য মাধ্যম

—ঃ যোগাযোগ করুন ঃ—

২৭/১বি, বিধান সরণি,

কোলকাতা-৭০০০০৬

দূরভাষ (০৩৩) ২২৪১০৬০৩, ২২৪১৫৯১৫

পশ্চিমবঙ্গে বিপন্ন মানবাধিকার

অন্ধকারাচ্ছন্ন বর্তমান

অম্লানকুসুম ঘোষ

মানবাধিকার হরণের দ্বিতীয় পর্যায় হলো রাজনৈতিক মানবাধিকার হরণ। মানবশরীরে যেমন বুদ্ধির প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গেই ঘটে হস্তপদাদির সঞ্চালন, তেমনই সমাজজীবনে বৌদ্ধিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ঘটে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ। রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটা জনসাধারণের পক্ষে যতটা ভালো ক্ষমতাবানের পক্ষে ততটাই ক্ষতিকর।

প্রাণীদেহের সুস্থ বিকাশ ও বৃদ্ধির জন্য যেমন অবশ্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন, তেমনই মানবসমাজের মনোজগতের ও আনুষঙ্গিকভাবে সামগ্রিক বিকাশের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় হলো মানবাধিকার। সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই এই অধিকারের জন্য সোচ্চার হয়েছে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মনুষ্যকুল। সেই আদিলগ্নে ভারতবর্ষই ছিল সাধারণ মানুষের মানবাধিকারের বিভিন্ন দিক রক্ষায় সর্বাপেক্ষা তৎপর। কিন্তু আজ অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে সাধারণ মানুষ লক্ষ্য করছে যে সেই ভারতবর্ষেরই একটি রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে (যে রাজ্য একদা মানবাধিকার রক্ষায় গোটা ভারতবর্ষকেই পথ দেখিয়েছে) মানবাধিকার আজ ভয়াবহভাবে লঙ্ঘিত। কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে নয়, এ রাজ্যে মানবাধিকার লঙ্ঘন এখন হচ্ছে দৈনন্দিন জীবনযাপনের প্রায় সব ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন পর্যায়ে। পর্যায়ক্রমে আলোচনায় আসা যাক।

পশ্চিমবঙ্গে মানবাধিকার লঙ্ঘনের সর্বোচ্চ পর্যায় হলো বৌদ্ধিক পর্যায়। বুদ্ধিজীবীদের বুদ্ধিপ্রয়োগের অধিকার এবং বাক্-স্বাধীনতা হরণ করা মানবাধিকার লঙ্ঘনের সবচেয়ে বড় ঘটনা। ই-মেলে কার্টুন প্রেরণের অভিযোগে জনৈক অধ্যাপকের লাঞ্ছনা থেকে শুরু করে খবর সংগ্রহকারী সাংবাদিকদের হেনস্থা, শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষক- অধ্যাপকদের নিয়ত অপমান সবই সেই বৌদ্ধিক মানবাধিকার হরণের নামান্তর। মানবশরীর যেমন বুদ্ধি থেকে সমস্ত অঙ্গের সঞ্চালন সমাজজীবনেও তেমনি শিক্ষাব্রতী বা বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিসমূহের থেকেই সমাজের বাকি অংশের বিকাশ ও মত পরিবর্তন সব হয়ে থাকে। তাই সেই সমাজের সেই বৌদ্ধিক অংশের মানবাধিকার হরণের দ্বারা সমস্ত সমাজকে পঙ্গু করে দেওয়া ক্ষমতাসীনের বরাবরের উদ্দেশ্য। বিগত জমানায় আশির দশকে বাংলার সর্বপ্রধান দৈনিকের প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া---এটা মানবাধিকার হরণেরই নিদর্শন। এখানে যেন আমরা শুনি হীরক রাজার কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি—‘এরা যত বেশি পড়ে তত বেশি জানে তত কম মানে।’ তাই অপরাধী চিহ্নিত হয় সহজেই ‘এই মাস্টারটাই আসল বদমাশ।’ ব্যাপক অর্থে শুধু শিক্ষক নন শিক্ষাকর্মের সঙ্গে যুক্ত সকল ব্যক্তিই (অর্থাৎ লেখক, সাংবাদিক, সমালোচক সবাই)। তাই এই বৌদ্ধিক মানবাধিকার হরণ।

মানবাধিকার হরণের দ্বিতীয় পর্যায় হলো রাজনৈতিক মানবাধিকার হরণ। মানবশরীরে যেমন বুদ্ধির প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গেই ঘটে হস্তপদাদির সঞ্চালন, তেমনই সমাজজীবনে বৌদ্ধিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ঘটে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ। রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটা জনসাধারণের পক্ষে যতটা ভালো ক্ষমতাবানের পক্ষে ততটাই ক্ষতিকর। তাই ইতিহাসের পাতায় চোখ বোলালে দেখতে পাই যুগে যুগে দেশে দেশে জাগ্রত রাজনৈতিক চেতনাকে টুঁটি চেপে ধরতে বদ্ধপরিকর শাসকের হাতে জনসাধারণের রাজনৈতিক মানবাধিকার হরণ। পশ্চিমবঙ্গ এর ব্যতিক্রম তো নয়ই বরং এখানে এ ব্যাধি অনেক বেশি প্রকট। পূর্বতন শাসকদের হাত থেকে রাজনৈতিক বিরোধীদের পিষ্ট করার ব্যাটন নির্বিঘ্নে হাতবদল হয়েছে বর্তমান শাসকদের কাছে। তাই আমরা দেখি আজ

গোটা পশ্চিমবঙ্গে দিকে দিকে বিরোধী রাজনৈতিক মানসিকতার ব্যক্তিদের ওপরে রাষ্ট্রতন্ত্রের নির্মম দমনপীড়ন। শুধু রাজনীতি করা নয়, নিজের রাজনৈতিক মতামত খোলা মনে বলার অধিকারও হারাচ্ছে রাজ্যবাসী।

মানবাধিকার হরণের তৃতীয় পর্যায় হলো অর্থনৈতিক মানবাধিকার হরণ। মানব শরীরে বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন হয় তার জন্য প্রয়োজন হয় ফুসফুসের তাজা অক্সিজেনের। সমাজজীবনে সেই অক্সিজেনের ভূমিকায় আছে অর্থনীতি। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকলে অর্থাৎ অর্থনৈতিকভাবে পরনির্ভর (সরকার নির্ভর বা নেতানির্ভর বা সরকারি দলনির্ভর বা সরকার ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী নির্ভর) হলে বৌদ্ধিক বিকাশসমৃদ্ধ রাজনৈতিক চেতনাঋদ্ধ প্রতিবাদ সংগঠিত করা সম্ভব হয় না কোনও ব্যক্তিবিশেষের পক্ষেই। তাই অর্থনৈতিকভাবে মানুষকে পঙ্গু করে রাখলে পরোক্ষে মানবাধিকার হরণ করা যায় সহজেই। তাই আমরা আজ দেখছি রাজ্য জুড়ে স্থায়ী সরকারি পদে নিয়োগ বন্ধ হয়েছে নানারকমভাবে। ২০১১ সালের পর থেকে কলেজ সার্ভিস কমিশনের নিয়োগ এখনও বন্ধ আছে। ২০১১-র পর গত চারবছরে স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা হয়েছে মাত্র একবার। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা বন্ধ হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে (WBCS ছাড়া কোনও পরীক্ষা প্রত্যেকবছর হয়নি, ক্লার্কশিপ হয়েছে একবার)। পাশাপাশি দেখতে পাচ্ছি অস্থায়ী অধ্যাপক, পার্শ্বশিক্ষক, সরকারি দপ্তরে অস্থায়ী কর্মীদের ছড়াছড়ি। যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে স্থায়ী চাকরি করা যে ব্যক্তি অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জোরে মেরুদণ্ড সোজা রেখে নিজের মানবাধিকার সম্বন্ধে সচেতন হতে পারেন, স্থায়ী চাকরির অভাবে বেকারত্ব এবং তজ্জনিত দুরবস্থা থেকে মুক্তির আশায় অস্থায়ী কর্মীরূপে কর্মে যোগ দিয়ে সেই ব্যক্তিই চাকরি বজায় রাখার খাতিরে বিসর্জন দেবেন নিজের বিবেককে, বিকিয়ে দেবেন আপন মানবাধিকারকে।

মানবাধিকার হরণের অন্তিম পর্যায় হলো ব্যক্তিগত মানবাধিকার হরণ। কোনও বড় গাছকে যদি নির্মূল করতে হয় তাহলে যেমন শাখা-প্রশাখা, কাণ্ড ছেদন করার পরে যেমন শেকড়েরও বিনাশ করতে হয়, তেমনই মানবসমাজ থেকে মানবাধিকার-বোধকে নির্মূল করতে গেলে বৌদ্ধিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, মানবাধিকার হরণ করার পর ব্যক্তিগত জীবনে মানবাধিকার অর্জন করার যে অভ্যাস মানবজীবনে বিদ্যমান, সেই অভ্যাসকে দলিত মথিত করতে হয়। যাতে মানবাধিকার সম্বন্ধে, ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্বন্ধে ন্যূনতম ধারণা থেকেই বঞ্চিত হয় জনসাধারণ। তখন তারা মানবাধিকার চাইতেই ভুলে যায়। তাই তো আজ দেখি, ব্যক্তিজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ক্ষমতাবানের অঙ্গুলিহেলন। গৃহনির্মাণকারীর নির্মাণসামগ্রী ক্রয়ের কালে বিক্রেতা নির্বাচন থেকে শুরু করে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীনের অঙ্গুলি হেলনেই চলতে হয় সকলকে। দাবি করার অভ্যাস, দাবি করা যেতে পারে এই জ্ঞানের অভাবে জনসাধারণ যদি দাবি করা ছেড়ে দেয় তাহলে শাসকের পক্ষে তার চেয়ে আনন্দের আর কিছু হতে পারে না। বর্তমানে তাই হতে চলেছে।

মানবাধিকার লঙ্ঘনের সামগ্রিক ফল যে কত বিষম তা বোঝা বর্তমানে দাঁড়িয়ে সম্ভব নয়। কিন্তু দূরদর্শী ব্যক্তিবর্গ যদি আপন মানসনেত্রে ভবিষ্যতের দিকে একটু দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন তাহলেই বুঝতে পারবেন কী ভয়ঙ্কর দিন অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য। কী দুর্যোগের রাত্রি অপেক্ষা করছে একদা স্বাধীনতার ঊষার সাক্ষী, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যাহ্নযাপনকারী ও বর্তমানের গোধূলিবেলায় অবস্থানকারী এই জাতির ভাগ্যে। মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলে মানুষ আত্মসম্মানবোধ হারায়। আর মান ও হুঁশের সমন্বয়ে গঠিত মানুষের নিজের মান সম্পর্কে হুঁশ না থাকলে তার মনুষ্যত্বও বিঘ্নিত হয়। সে তখন নরদেহধারী পশুর জীবন যাপন করতে থাকে। দীর্ঘদিন বিদেশির অধীনে থাকা ভারতবর্ষে একসময় স্বামীজী এই পশুত্বের লক্ষণ দর্শন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মহান উপস্থিতি, প্রচণ্ড কর্মশক্তি ও মহাজ্ঞানের দ্বারা তিনি ভারতবর্ষকে সেই পশুত্ব থেকে মনুষ্যত্বে উন্নীত করতে পেরেছেন। মনুষ্যত্বের অধিকারী ভারতবর্ষ স্বাধীনতাও অর্জন করেছিল অচিরাৎ। কিন্তু আজ স্বাধীনতার অর্ধশতকেরও বেশি পরে যদি পুনরায় ইতিহাসের চাকা উলটোদিকে ফেরে? যদি প্রায়ান্ধকার বর্তমানের মানবাধিকারহীন জনসাধারণ পুনরায় মনুষ্যত্ব চ্যুত হয়, তাহলে কোন তামস তমসা অপেক্ষা করে আছে আমাদের জন্য তা একমাত্র মহাকালেরই গোচর।

রাত্রি যতই গভীর হোক, অন্তিমে তার প্রভাতসূর্যের উদয় অবশ্যম্ভাবী। সমাজ যতই জটিল হোক, সমাধান তার আছে নিশ্চয়ই। প্রকৃত শিক্ষিত আত্মসচেতন, আত্মমর্যাদায় পরিপূর্ণ ব্যক্তিদের আজ একত্রিত হতে হবে, সক্রিয় হতে হবে এবং সজাগ থাকতে হবে যাতে বহু সাধনার বিনিময়ে অর্জন করা এই মানবাধিকার কেউ ছিনিয়ে না নিতে পারে। সচেষ্ট হতে হবে এই ভেবে যে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলে, আত্মসম্মান আহত হলে মানুষ মনুষ্যত্ব-চ্যুত হলে আঘাত আসে আত্মার, সেই আঘাত নিরাময় অযোগ্য। তাই প্রাণের চেয়েও বড় সেই আত্মসম্মানকে সেই মানবাধিকারকে রক্ষার জন্য সর্বাগ্রে এগিয়ে আসতে হবে কলমধারী বুদ্ধিজীবীদেরই। তাঁদের নেতৃত্বে জাগ্রত জনসাধারণ যদি ঐক্যবদ্ধ হতে পারে তাহলে মানবাধিকারকে বিপন্ন করার এমন শক্তি ইতিহাসে বিরল হয় পড়বে।

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ
সাপ্তাহিক
স্বস্তিকা
পড়ুন ও পড়ান
বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০ টাকা
প্রতিকপি ১০ টাকা

চিঠিপত্র

পার্কে মসজিদ!

সম্প্রতি এক খবরে প্রকাশিত যে বালিগঞ্জ ফাঁড়িতে পার্ক দখল করে কালীপূজা কমিটির লোকজন অনুমোদনহীন একটি ক্লাবঘর তৈরি করেছে। পুরসভার উদ্যান বিভাগের মেয়র পরিষদ সদস্য দেবাশিষ কুমার উক্ত অবৈধ নির্মাণকারীদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানিয়ে বলেছেন, সংশ্লিষ্ট বিভাগ শীঘ্রই নির্মাণটি ভেঙ্গে দেবে। পরিবেশ সুরক্ষিত করার এই প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য এবং রাজ্যবাসী বিশেষত কলকাতাবাসী নিশ্চয়ই খুশি হবে। কিন্তু সবক্ষেত্রে কুমার সাহেবরা যদি সমদৃষ্টি দিতেন তাহলে পার্কসার্কাস ময়দানের ভিতরে অবস্থিত মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্ত ও কবি মুকুন্দ দাসের স্ট্যাচু ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়ে সুউচ্চ একটি মসজিদ নির্মাণ কোন বৈধতার ভিত্তিতে হচ্ছে তা বোধগম্য হচ্ছে না।

যদি মসজিদ নির্মাণের বৈধতা থাকে তাহলে রাজ্যবাসী প্রশ্ন করতেই পারে যে পার্কসার্কাস ময়দানের মতো নেতাজী, গান্ধীজী, মতিলাল নেহরু, মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্ত ও কবি মুকুন্দ দাসের স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পরিবেশ সুরক্ষার বিষয় জলাঞ্জলি দিয়ে কিসের আশায় অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

যদি মসজিদ তৈরির বৈধতা না থাকে তাহলে বালিগঞ্জ ফাঁড়ির পার্কে নির্মিত ক্লাব ঘরটির মতো পরিবেশ সুরক্ষিত করার স্বচ্ছ ও মুক্ত চিন্তাকে ফলপ্রসূ করতে নিশ্চয়ই মেয়র পরিষদ সদস্য উক্ত মসজিদ নির্মাণ কর্তাদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করবেন ও অবৈধ নির্মাণটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দিয়ে ভাঙ্গাবেন। যদিও পার্কসার্কাস ময়দানে হিন্দুরা বহু বছর ধরে অস্থায়ী মণ্ডপ তৈরি করে সার্বজনীন দুর্গাপূজা করে আসছে। যদি হিন্দুরা উক্ত ময়দানে একটি সুউচ্চ মন্দির করতে চায় তাহলে প্রশাসন তার বৈধতা দেবে তো?

ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়েছিল দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে তবুও বর্তমান ভারতবর্ষে যত মসজিদ ও মাদ্রাসা আছে ও বিগত তিন-চার বছরে যত তৈরি হয়েছে তা কোনো ইসলামিক রাষ্ট্র তথা পাকিস্তান বা বাংলাদেশে হয়নি। সংখ্যালঘুর নামে আমাদের দেশের ধর্মদ্রোহী, আত্মহননকারী নেতা-নেত্রীরা শুধু মুসলমানদের তোষণ করে চলেছে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে। ফলে হিন্দুরা নিজদেশে পরবাসী হয়ে অজানা আতঙ্কের মধ্যে ভবিষ্যতের দিকে কোনোক্রমে এগিয়ে চলেছে। এক হাজারেরও বেশি বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্ত করতে কত নারী-পুরুষ জীবন বির্সজন দিয়েছেন, কিন্তু সেই আত্মত্যাগ এই জাতিদ্রোহী দেশদ্রোহী মির্জাফরমার্কা নেতানেত্রীদের এতটুকু বিচলিত করে না। এইরকম সংখ্যালঘুর নামে মুসলমান তোষণকারী প্রশাসন চলতে থাকলে অচিরেই এদেশ পুনরায় শৃঙ্খলাবদ্ধ হবে।

চীন ও ইজরায়েল তাদের জাতীয়তাবাদ নিয়ে যে রকম সচেতন ও যত্নবান, আমাদের দেশে বেশিরভাগ নেতা-নেত্রীর মধ্যে তার ছিঁটেফোঁটাও নেই।

—**পবন চৌধুরী,**
বেহালা।

জরুরি অবস্থা

''জরুরি অবস্থায় সেই ঐতিহাসিক সত্যাগ্রহ'' অজিত বিশ্বাস মহাশয়ের প্রতিবেদন (১৩ জুলাই স্বস্তিকা) প্রসঙ্গে এই চিঠি।

বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে মানব শরীরেও জরুরি অবস্থা জারি করার প্রয়োজন হয় শরীরের অস্থিরতার দূর করার জন্য, শরীর বাঁচানোর জন্য। সেক্ষেত্রে ডাক্তার জরুরি অবস্থা জারি করে আমাদের এক বিশেষ চাপের মধ্যে ফেলে দেন আমাদের মঙ্গলের জন্যই। আমরা তা মেনে নিলে নিজের মঙ্গল, না মানলে ক্ষতি। কিন্তু কেউ যদি অপ্রয়োজনে তার শরীরে অযথা ওযুধ প্রয়োগ করে জরুরি অবস্থা জারি করেন তা হলেও তার ক্ষতি।

১৯৭৫ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী যে জরুরি অবস্থা জারি করেছিলেন তা সুস্থ শরীরে উচ্চ শক্তির উচ্চমাত্রার ওযুধ প্রয়োগ করার মতোই বিপজ্জনক। গণতন্ত্রকে পৈতৃক সম্পত্তিতে পরিণত করার কুফল হিসাবে সেই রাজনৈতিক কালো জরুরি অবস্থা লাগু করেছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। শ্রীমতী গান্ধী তার ফলও পেয়েছিলেন হাতে হাতে। জরুরি অবস্থা তো দেশের চিকিৎসার প্রয়োজনে তৈরি একটি ওযুধ। ভুল প্রয়োগে ক্ষতি।

তৎকালীন জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে মানুষ সত্যাগ্রহ করেছিল। আমার মতে গণতন্ত্র বিপন্ন হলে জরুরি অবস্থা প্রয়োগের পক্ষেও সত্যাগ্রহ করা দরকার। এমনকী ব্যাপক প্রয়োগের পরিবর্তে জরুরি অবস্থার ক্ষুদ্র সংস্করণ প্রয়োগ করার সংস্থান থাকা দরকার। দেশের অনেক রাজ্যেই আনাচে-কানাচে গণতন্ত্র হত্যা করে, সরকার বিরোধী মানুষকে হত্যা করে, বাড়িঘর জ্বালিয়ে, সম্পত্তি হরণ করে রাজ্যকে ও গণতন্ত্রকে পৈতৃক বানানো হচ্ছে। এর চিকিৎসার জন্য আঞ্চলিকভাবে জরুরি অবস্থা জারি করে গণতন্ত্র, বিচার ব্যবস্থা ও ব্যক্তিকে বাঁচানোর উপযুক্ত ব্যবস্থা করা উচিত। দেশদ্রোহিতার মোকাবিলায় জরুরি অবস্থার ক্ষুদ্র সংস্করণ খুবই জরুরি। ভারতের মতো একটি অতিদুর্নীতিপ্রবণ দেশে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ মোটেই উপকারী নয়, চরম অপকারী, তার প্রমাণ প্রতিনিয়ত মিলছে। উল্লেখ্য ৩৫৫ বা ৩৫৬ ধারাও জরুরি অবস্থারই একটি বিকল্পরূপ।

কোনো কোনো রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি সত্ত্বেও ৩৫৫ বা ৩৫৬ ধারা জারি করার সাহস কেন্দ্র দেখাতে পারে না, পাছে জনগণ ভুল বুঝে বিমুখ হয়ে যায়। তার ফল হিসাবে কোনো কোনো রাজ্যে বিরোধীদল বিনাশের অবস্থায় চলে যায়, আর প্রাণহানি হয় অসংখ্য মানুষের, সম্পত্তি

অপহৃত হয়। ৩৫৬ ধারা বা ৩৫৫ ধারাও আঞ্চলিকভাবে উপদ্রুত এলাকায় প্রয়োগ করার সংস্থান রাখা উচিত। অন্যথায় এক-একটি ঘটনা ঘটার পর তা শুধুমাত্র খবর হবে, তা নিয়ে আলোচনা হবে কিন্তু কাজের মতো কাজ কিছু হবে না--- আপনজন যার যাবে সর্বনাশ তারই হবে। 'ওষুধ তৈরি করব কিন্তু ব্যবহার করব না, চিকিৎসা করব কিন্তু ওষুধ দেব না, শুধু ভান করব, কিন্তু রোগী বাঁচাবো না' তাহলে মাৎস্যান্যায় চলতেই থাকবে অনন্তকাল ধরে।

—**টিমিড পেনস্পিকার,**
কল্যাণী।

ভারতের নেতৃত্বে যোগদিবস

রাষ্ট্রসঙ্ঘ সম্প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে গোটা বিশ্বে ২১ জুন তারিখটিকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসাবে ঘোষণা করেছে। এই ধরনের মৌলিক ভাবনাকে বিশ্বের দরবারে স্বীকৃতি দিতে রাষ্ট্রসঙ্ঘ প্রস্তুত থাকলেও শুরুর দিকে অনেক দেশই এমনকী দেশের মুসলমান বন্ধুরাও এতে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ পাচ্ছিলেন। যাই হোক, শেষপর্যন্ত প্রায় সবাই যোগের বিষয়ে একযোগে এই অভিনব পদক্ষেপে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এসেছেন। যেহেতু যোগ অনুশীলন ধর্মনির্বিশেষে সকল মানুষের জন্যই উপযোগী, তাই কেউই নিজেদের ক্ষেত্রে এটাকে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করেননি। বিতর্কগুলিতে যোগ-ব্যায়াম, আসন বা প্রাণায়ামের উপকারিতা-অপকারিতা নিয়ে আলোচনা না হয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে সাম্প্রদায়িকতার রঙ খোঁজা হয়েছে যা দুঃখের। অবশেষে প্রায় চল্লিশটিরও বেশি মুসলমান দেশ জানিয়ে দেয় তারা এই বিশেষ দিনটি পালনে সামিল হবে। এছাড়াও আমেরিকা, ইউরোপের দেশগুলি, জার্মানি, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও জাপানেও 'আন্তর্জাতিক যোগ দিবস' সাড়ম্বরে পালিত হয়। বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ নিউইয়র্কে রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রধান বান-কি-মুন-এর সঙ্গে যোগ উদ্‌যাপনে যোগ দেন। এছাড়াও ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মন্ত্রী ও যোগ বিশেষজ্ঞরা অন্য দেশগুলিতে গিয়ে যোগ দিবস পালনে নেতৃত্ব দান করেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দিল্লীর রাজপথে প্রায় ছত্রিশ হাজার মানুষকে সঙ্গে নিয়ে সকাল বেলাতেই যোগ চর্চায় সক্রিয়ভাবে যোগ দেন। রাজপথ যেন 'যোগপথ'-এ পরিণত হয়েছে বলে তিনি আপ্লুত হয়ে অভিমত ব্যক্ত করেন। বলা চলে, ভারতের হাত ধরেই আরও একবার যোগ পৌঁছে গেল পৃথিবীর দরবারে। আমার মনে হয় স্বামী বিবেকানন্দের কথা, ভারত আধ্যাত্মিকতায় গোটা বিশ্বকে পথ দেখাবে— সে কথাই সত্যি হতে চলেছে যোগ দিবস পালনের মাধ্যমে।

—**অত্রি মল্লিক,**
কলকাতা।

হতভাগ্য পদ্ম

গত ২৯ জুন একটি সংবাদপত্রে 'নেত্রীর মন রাখতে উধাও পদ্ম' শিরোনামে একটি খবর প্রকাশিত হয়। খবরের মূল বিষয়বস্তু হলো ৩০ জুন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর জেলা সফরের জন্য বহরমপুর রবীন্দ্রসদনকে নীল সাদা রঙে রঙ করা হয় এবং রবীন্দ্রসদনের ফোয়ারার সামনের কৃত্রিম জলাশয় থেকে তুলে ফেলা হয় প্রস্ফুটিত পদ্মফুল।

কে কার মন রাখতে গিয়েছে সে বিতর্কে যাচ্ছি না। কোনো রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েও ঘটনাটির মূল্যায়ন করছি না। একজন সাধারণ ভারতীয় হিসেবে এইটুকু বলতে পারি যে জাতীয় পতাকা, জাতীয় পশু, জাতীয় ফুল প্রভৃতির সম্মান রক্ষা করা আমাদের জাতীয় দায়িত্ব এবং কোথাও এদের অবমাননা হলে দলমত নির্বিশেষে প্রত্যেক ভারতীয়র প্রতিবাদ করা উচিত।

—**পদ্মপ্রিয় পাল,**
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

'যথা নিযুক্তোঽস্মি'

ড. ইন্দ্রজিৎ সরকার তাঁর নিবন্ধে (স্বস্তিকা, ৯.২.১৫) জানিয়েছেন, 'জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ। কেনাপি দেবেন হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।।' কথাগুলি দুর্যোধন বলেছিলেন। দুর্যোধনের ওই ধরনের কোনো উক্তি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত মহাভারতে খুঁজে পেলাম না। শুধু 'যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি' কথাটি পেলাম, যেখানে যুধিষ্ঠির বলেছেন— ''...প্রিয় অপ্রিয় তুল্যজ্ঞান করে, ভগবান আমাকে দিয়ে যা করান আমি তাই করব— যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি''— (শান্তি-পূর্ব, ১৬৭/৪৭)।

আমি অনেকদিন যাবৎ ড. সরকারের উল্লেখিত শ্লোকটির উৎস খুঁজে বেড়াচ্ছি। ড. সরকার যদি ওই বিষয়ে বিশদ জানান, বিশেষ বাধিত হব।

—**বিমলেন্দু ঘোষ,**
কলকাতা-৬০।

চৈনিক বিশ্বাসঘাতকতার নজির সীমাহীন

ইদানীংকালে UNO-তে লাখভির মুক্তি প্রচেষ্টা ছাড়াও ব্রহ্মপুত্র নদীর উপরাংশে চারটি পাওয়ার প্ল্যান্ট তৈরির এবং পাকিস্তানের সঙ্গে কাশ্মীরের বিতর্কিত অঞ্চল দিয়ে রেল লাইন করার প্রচেষ্টা অন্যতম।

ভারত সরকার সরাসরি সম্মুখ সমরে এর প্রতিকার করতে পারে। অথবা কারিগরী বিশেষজ্ঞ দ্বারা ভারত এমন একটা ব্যবস্থা করতে পারে যাতে উপরোক্ত প্রকল্পদ্বয় বন্যা প্লাবিত হয়ে যায়। এই ব্যাপারে যদি ইচ্ছা করে ভারত সরকার আই.ই.আই-এর সাহায্য নিতে পারে।

—**সুকুমার মুখার্জী,**
শিবপুর, হাওড়া।

পরম্পরা

ধর্ম সংসদের স্রষ্টা বসবেশ্বর

ভি. সন্মুগনাথন

দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এপিজে আবদুল কালাম ভারতের সংসদ ভবনে উদ্বোধন করেছিলেন এদেশের এক বিখ্যাত মানুষের প্রতিমূর্তির— বারো বছর আগে ২৮ এপ্রিল ২০০৩। সেই বিখ্যাত মানুষটির নাম বসবেশ্বর। তাঁর সম্মানে প্রকাশ করা হয় বিশেষ মুদ্রা। বসবেশ্বরের অনন্য ভূমিকা ছিল সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে। অনেক বছর আগের মানুষ তিনি। তবে তাঁকে যথাযথ সম্মান জানাবার এই উদ্যোগও স্মরণীয়। এবছর ২১ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সাংসদদের বলেছেন, আসুন আমরা স্মরণ করি ও শ্রদ্ধা জানাই ভারতীয় দার্শনিক ও সমাজ সংস্কারক বসবকে, যিনি সংসদের এক নমুনা তৈরি করেছিলেন ১১৬০ খৃস্টাব্দ নাগাদ। বসবের একটি মূর্তি বসছে লন্ডনে তাঁর প্রতি সম্মান জানিয়ে। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে তিনি সংসদ কেমন হওয়া উচিত তার আদল তৈরি করেছিলেন। আসলে সেই ভাবনা ছিল তথ্য সংগ্রহের জন্য। নানাদিক থেকে তথ্য আসবে। তার আদান-প্রদান হবে। তার মাধ্যমে শিক্ষা সংস্কৃতির বিকাশ ঘটবে। সেখানে বিতর্ক হবে, সমাধান সূত্রও মিলবে। এই ভাবনা থেকেই সেই যুগেও বসবেশ্বর একটা সংসদের নমুনা তৈরি করেন। নাম ছিল : 'অনুভব মণ্ডপ'। যেখানে সমসংখ্যক নারী-পুরুষ প্রতিনিধি আসত সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে। যাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থায় তফাত ছিল। কিন্তু একজায়গায় গিয়ে তারা কথা বলতে পারতেন। নিজেদের ভাবনা প্রকাশের সুযোগ ছিল।

এই বিদ্বান মানুষটি সমাজ সচেতনতার প্রসারের জন্যে কবিতা রচনা করে লোকশিক্ষার উদ্যোগ নিতেন। প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত ধর্মতত্ত্ব নিয়ে আকর্ষণীয় আলোচনা করতেন। তার নাম ছিল বচনম্। বসবের ব্যাখ্যার মধ্যে ছিল যুক্তি ও বিশ্লেষণের স্বচ্ছন্দ ভঙ্গি। যা আগে কোনও ধর্মতাত্ত্বিকের আলোচনায় শোনা যায়নি।

তিনি সাধারণ মানুষকে শিক্ষা দিতেন কীভাবে সুখে বাঁচবে যুক্তিবাদী সমাজধারা মেনে। তাঁর সেই বিশেষ ধারার নাম হয় জীবন আন্দোলন। তিনি ব্যাখ্যা করে বোঝান ঈশ্বরের অবস্থান প্রত্যেক মানুষের দেহে চারভাবে রয়েছে। তিনি শেখান প্রত্যেক প্রাণের সঙ্গে জীবন কীভাবে জড়ানো। তিনি বলেন ইষ্টলিঙ্গ প্রাণলিঙ্গ ভাবলিঙ্গর সাধনার কথা। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, পৃথিবীর যে কোনও মানুষ জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে ঈশ্বরের কৃপা পেতে পারে প্রাণের যথাযথ সমন্বয়ে।

দার্শনিক ও সমাজ সংস্কারক পরিচয়ের বাইরে তাঁর অন্য পরিচয় ছিল অনুগামীদের কাছে 'বিশ্ব গুরু'। কানাড়ি সাহিত্যে তাঁর অবদান ছিল বৈপ্লবিক। উপনিষদ ও বেদান্ত অবলম্বনে তিনি কানাড়ি ভাষায় অসাধারণ বচন সাহিত্য সৃষ্টি করেন। তাঁর প্রয়াসে অনুপ্রাণিত হয়ে এগিয়ে আসেন অনেক শিক্ষিতজন। তাতে সমৃদ্ধ হয় সাহিত্য। বসবেশ্বর বারো বছর শৈবসাধনা সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জনের জন্য 'সঙ্গমেশ্বর' পীঠকে করেন শৈব শিক্ষাকেন্দ্র। সেখানে পণ্ডিতদের সংস্পর্শে এসে তাঁর আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় ভাবনা বিকশিত হয়। ইষ্টলিঙ্গকে তিনি ব্যবহার করেন। ঈশ্বরের জপ জিহ্বার মধ্যে আছে। অস্পৃশ্যতা দূর করা এবং সব মানুষের মধ্যে ঐক্যের কথা বলে তিনি আধ্যাত্মিক বিকাশের পথ দেখান।

এরকম একজন প্রকৃত সংস্কারক এক শতাব্দীতে একবারই আসেন। তিনি অতীতের বিশ্লেষণ করে নতুন বিন্যাসে

ধর্মসংসদ বা অনুভব মণ্ডপ

সাহায্য করেন। তাঁর দায়িত্ব বিপ্লবের নয়, পুনর্জাগরণের। যে সংস্কার আন্দোলন তিনি শুরু করেন তা অনেকদূর এগোয় দেশের সামাজিক জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। আমরা যতক্ষণ বসবেশ্বরের কার্যধারাকে ধর্মীয় দৃষ্টিতে দেখব ততদিন তাঁর ব্যক্তিত্ব ও অসাধারণ উপদেশাবলীকে বুঝতে পারব না। তিনি বলেন, গোরু কখনও দুধ দেবে না যে তার পিঠে চাপে। দুধ দেবে তাকে যে হাঁটু মুড়ে পায়ের সামনে বসে। তাঁর মহান দৃষ্টিতে উঁচু নিচু সকলে সমান ছিল। এই উদার মনোভাব দেশে বা অঞ্চলের গণ্ডীবদ্ধ জীবনধারা অতিক্রম করে বিস্তৃত হয়েছিল বহুদূর পর্যন্ত। বসবের প্রতিষ্ঠিত অনুভব মণ্ডপ সামাজিক গণতন্ত্রের কথা বলে—এক সামাজিক সমাজে সকলে সমস্ত সামাজিক অধিকার ভোগ করে। এবং অধিকারকে পেতে জাত ধর্ম বয়সের কোনও বাধা থাকবে না। কর্ণাটকের বাসবকল্যাণে বসবেশ্বরের ১০৮ ফুট উঁচু মূর্তি রয়েছে। বেদিতে বসে আছেস। ডান হাতে আশীর্বাদের ভঙ্গি। বাঁ হাতে পুঁথি। প্রশান্ত মুখ। এই মানুষটি একদা সমাজ-বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। স্থবির জড়তাবদ্ধ সমাজের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন—রাষ্ট্রের সব নাগরিকই শ্রমিক। যিনি দৈহিক শ্রম করছেন তিনি যেমন শ্রমিক, তেমনি বৌদ্ধিক কাজ করছেন তিনিও শ্রমিক। তিনি অনুশীলনকে উপদেশের আগে স্থান দিয়েছিলেন। জীবনযাপনে নিয়মনিষ্ঠ ছিলেন। এই মহান পণ্ডিত মানুষটি তার শিক্ষা ও জীবন সাধনার মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে বলতে চেয়েছেন, আত্মশুদ্ধি সবসময় জরুরি। তিনি সাধারণ মানুষের জীবনধারার স্তরকে উন্নত করতে চেয়েছিলেন। এবং আচার-ব্যবহারের ক্ষেত্রে এমন কিছু রীতি প্রয়োগের কথা বলেছেন যা একই সঙ্গে প্রশাসক ও সমাজের সাধারণ মানুষ মেনে চলে।

শারীরিক শ্রমকে মর্যাদা দিতে চেয়েছিলেন সবসময়। বলেছিলেন কর্মই হলো ধর্মসাধনা। তার ফলে কলাকুশলতা বেড়েছে, মর্যাদা পেয়েছে বিভিন্ন সৃজনকর্ম। তাতে ইতিহাসে অন্য অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পালাবদল ঘটেছে।

বসবেশ্বর জনগণের প্রতিনিধি নিয়ে বিভিন্ন পেশার ক্ষেত্রে জাগতিক কমিটি বা সমিতি গড়েন। চাষবাস, উদ্ভিদচর্চা, সেলাই কর্ম, বোনার কাজ, রঙ করা, কাঠের কাজ—এসব গুরুত্ব পায়। সব পেশার মানুষ পাচ্ছেন সমমর্যাদা এবং সমগুরুত্ব। সেসময়ে বেশ কিছু নাম পাওয়া যায় যাঁরা পেশাদারি নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে মর্যাদা লাভ করেন। এঁরা প্রত্যেকেই নিজের পেশার গৌরব কথা মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করেন।

বসবেশ্বর তাঁর উপদেশ ও সমাজকল্যাণের কাজের মাধ্যমে নারী জাগরণ ও স্বাধীনতার সপক্ষে ধারাবাহিকভাবে কথা বলেন। তাঁর আগে আর কোনও সমাজ সংস্কারক বা সমাজের হিতচিন্তক ওইভাবে পরিকল্পনা মাফিক কাজে উদ্যোগী হননি। বসবেশ্বর গড়েন অনুভব মণ্ডপ। যার ভিত্তি ছিল ভালোবাসা ও বিশ্বাস। এর মাধ্যমে নীতি ও শিক্ষার এক রীতি গড়ে ওঠে। আর এর থেকে অনুপ্রেরণা আসে সামাজিক ও ধর্মীয় স্বাধীনতার। তাঁর আগে ভারতে ওই ধরনের কোনও উদ্যোগ দেখা যায়নি। মধ্যযুগে কিছু মানুষের মধ্যে যেখানে ঈর্ষা এসেছিল, বসবের উদ্যোগে সেখানে এলো আলো। সেই আলো ছড়িয়ে পড়ল মানুষের হৃদয়ে এবং গৃহাঙ্গনে। হিন্দু ধর্মের তাতে মঙ্গল হলো। এলো মুক্ত আলোর অফুরন্ত ঝরনা। এই আন্দোলন-সাহিত্য পেল ধ্রুপদীর মর্যাদা। এর ফলে জাতিভেদের বাধা দূর হলো আর অস্পৃশ্যতা সরল। (সকলকে সম্পর্কে সমান চোখ দেখার ব্যাপারটা ঘটল।) এর ফলে পারিবারিক ক্ষেত্রে মর্যাদা বাড়ল নারীদের। আচার অনুষ্ঠানে এবং উপোস ও তীর্থযাত্রায় নারীর অংশগ্রহণ গুরুত্ব পেলো। উৎসাহ দেওয়া হলো শিক্ষায় আর বলা হলো প্রেম ও বিশ্বাস মিশে তৈরি হয় ঈশ্বর সাধনা। চিন্তা ও কার্যের মধ্যে উন্নত মাত্রা আসে নানা দিক থেকে।

তিনি সবসময় নম্রভাবে বলেন, 'কেউ আমার থেকে ছোট নয়।' তিনি কখনও প্রশংসা চাননি। তিনি জনগণের সঙ্গে কাজ করতে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি আন্তরিকতায়, সৌজন্যে, স্নেহে জনগণকে বাবা, ভাই সম্বোধন করতেন। তিনি উচ্চমার্গের দর্শনের কথা সারাজীবন ধরে প্রচার করে গেছেন। তিনি বলেছেন, ঈশ্বর এক। তিনি বিশ্বাস করতেন সব ধর্মের মূল রয়েছে সহমর্মিতার মধ্যে। হৃদয়কে উন্নত করে সেই ধর্মের কথা তিনি সমকাল ও উত্তরকালের জন্য লিখেছিলেন। বসবেশ্বর সেজন্যেই চিরকালীন আসন পেয়েছে এদেশের সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে। তিনি মুক্তিপথের দিশারি।

সৌজন্যে ঃ অর্গানাইজার (মে ৩, ২০১৫)

একটি উল্লেখযোগ্য দিকচিহ্ন

রূপশ্রী দত্ত

উনিশ শতকে বাঙলার রেনেসাঁসের অন্যতম অগ্রদূত ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র (২৪ জুলাই, ১৮১৪—২৩ নভেম্বর, ১৮৮৩)। তিনি একাধারে লেখক, সাংবাদিক এবং নানা গঠনমূলক কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

তাঁর পিতার নাম রামনারায়ণ মিত্র। তিনি ছিলেন বিখ্যাত ব্যবসায়ী। প্যারীচাঁদ, সে যুগের রীতি অনুযায়ী ফারসি ভাষা শিখেছিলেন। ১৮২৭ সালে হিন্দু কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। সেখানে হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও নামে এক তরুণ অধ্যাপকের উন্নত, আধুনিকতার মন্ত্রে তিনি ও আরও কয়েকজন সহপাঠী দীক্ষিত হয়েছিলেন। তাঁদের বলা হ'ত 'ইয়ংবেঙ্গল'। তিনি ছাত্রজীবনেই তৈরি নিজগৃহে একটি শিক্ষালয় করেছিলেন। নিজে যা শিখেছিলেন, অপেক্ষাকৃত কম জ্ঞানসম্পন্ন ছাত্রদের তা' শেখাতেন। ১৮৩৬ খৃস্টাব্দে তিনি ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির কিউরেটর নিযুক্ত হন। পরে 'থিওসফিক্যাল সোসাইটি'র সঙ্গেও যুক্ত হন।

সাংবাদিক হিসাবে তিনি 'ইংলিশম্যান' 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' ইত্যাদি সংবাদপত্রে লিখতেন। 'ইয়ংবেঙ্গল' দলের আরও দুই বন্ধুর সঙ্গে 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৮৫৭ সালে তাঁর কলমে সৃষ্টি হ'ল প্রথম বাংলা উপন্যাস 'আলালের ঘরে দুলাল'। বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্তের সংস্কৃত ঘেঁষা আলঙ্কারিক ভাষার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে রচনার ভাষাকে তিনি একেবারেই বাংলা কথ্যভাষার দিকে প্রবাহিত করলেন। পরবর্তীকালে তাঁর অনুকরণে কেউ কেউ ভাষার এই ভঙ্গিতে লেখার চেষ্টা করেছিলেন। এই রচনাভঙ্গি 'আলালী' ভাষা নামে চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিল। এই গ্রন্থ প্যারীচাঁদ লিখেছিলেন 'টেকচাঁদ ঠাকুর' ছদ্মনামে। বঙ্কিমের 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হয়েছিল আরও সাত বছর পরে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে।

প্যারীচাঁদ মিত্র

দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ'-এর ইংরেজি অনুবাদ (Indigo Mirror) করেছিলেন জেমস্ লঙ্। সাহিত্যোৎসাহী এই সমালোচক প্যারীচাঁদকে 'Dickens of Bengal' অভিধায় চিহ্নিত করেছিলেন।

প্যারীচাঁদ একটি প্রহসনধর্মী রচনা লিখেছিলেন। তা'র নাম—'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়' (১৮৫৯)। ছাত্রপাঠ্য টেক্সট্ বই রচনাতেও তাঁর অগ্রণী ভূমিকা ছিল। কৃষিকার্য বিষয়ক, ইংরেজি ও বাংলায় তিনি অনেকগুলি পুস্তক রচনা করেছিলেন। কিন্তু, তিনি সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় হ'য়ে আছেন উল্লেখযোগ্য এক গ্রন্থ রচনা করে—প্রসঙ্গ (context) ও প্রকরণের (Form) দিক থেকে, যা এখনও দিক্‌চিহ্নের ভূমিকা পালন ক'রে চলেছে। তা' হল 'আলালের ঘরে দুলাল'।

তথ্যসূত্র :

১. *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ* — শিবনাথ শাস্ত্রী

২. *সংসদ বাঙলা চরিতাভিধান* — সুবোধ সেনগুপ্ত ও অঞ্জলি বসু সম্পাদিত।

সবার প্রিয় ® বিল্লদা চানাচুর

'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর, বোলপুর,
জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

ঠুকে-মারি আর মুখে-মারি

সুকুমার রায়

মুখে-মারি পালোয়ানের বেজায় নাম— তার মতো পালোয়ান নাকি আর নেই। ঠুকে-মারি সত্যিকারের মস্ত পালোয়ান, মুখে-মারির নাম শুনে সে হিংসায় আর বাঁচে না। শেষে একদিন ঠুকে-মারি আর থাকতে না পেরে কম্বলে নব্বই মন আটা বেঁধে নিয়ে সেই কম্বল কাঁধে ফেলে মুখে-মারির বাড়ি রওনা হলো।

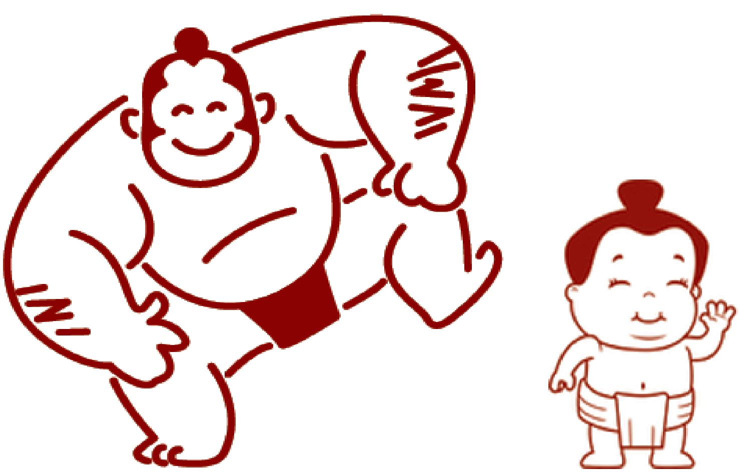

পথে এক জায়গায় বড্ড পিপাসা আর ক্ষিদে পাওয়ায় ঠুকে-মারি কম্বলটা কাঁধ থেকে নামিয়ে একটা ডোবার ধারে বিশ্রাম করতে বসল। তারপর চোঁ-চোঁ করে এক বিষম লম্বা চুমুক দিয়ে ডোবার অর্ধেক জল খেয়ে বাকি অর্ধেকটায় সেই আটা মেখে নিয়ে সেটাও সে খেয়ে ফেলল। শেষে মাটিতে শুয়ে নাক ডেকে ঘুম দিল।

সেই ডোবাতে একটা হাতি রোজ জল খেতে আসত। সেদিনও জল খেতে এল। ডোবা খালি দেখে তার ভারি রাগ হলো। পাশেই একটা মানুষ শুয়ে আছে দেখে সে তার মাথায় দিল গোদা পায়ের এক লাথি। ঠুকে-মারি বলল, 'ওরে, মাথা টিপেই দিবি যদি, একটু ভাল করে দে না বাপু!' হাতির তখন আরও বেশি রাগ হলো। সে শুঁড়ে করে ঠুকে-মারিকে তুলে আছাড় মারতে চেয়েছিল, কিন্তু তার আগেই ঠুকে-মারি তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে হাতি মশাইকে থলের মধ্যে পুরে রওয়ানা হলো।

খানিক দূর গিয়ে সে মুখে-মারির বাড়িতে এসে হাজির হলো, আর বাইরে থেকে চেঁচাতে লাগল— কই হে মুখে-মারি! ভারি নাকি পালোয়ান তুমি! সাহস থাকে তো লড় না এসে।

শুনে মুখে-মারি তাড়াতাড়ি বাড়ির পিছনে এক জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল। মুখে-মারির বৌ বলল, 'কর্তা আজ বাড়ি নেই। কোথায় যেন পাহাড় ঠেলতে গিয়েছেন।'

ঠুকে-মারি বলল, 'এটা তাকে দিয়ে বলো যে এর মালিক তার সঙ্গে লড়তে চায়।' এই বলে সে হাতিটাকে ছুঁড়ে তাদের উঠানে ফেলে দিল।

ব্যাপার দেখে বাড়ির লোকের চক্ষুস্থির! কিন্তু মুখে-মারির সেয়ানা খোকা হেঁড়ে গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'ও মা গো! দুষ্টু লোকটা আমার দিকে একটা ইঁদুর ফেলেছে। কি করি বল তো?' তার মা বলল— 'কিছু ভয় নেই। তোমার বাবা এসে ওকে উচিত শিক্ষা দেবেন। এখন ইঁদুরটাকে ঝাঁট দিয়ে ফেলে দাও।'

এই কথা বলামাত্র ঝাঁটার ঝট্‌পট্ শব্দ হলো আর খোকাটা বলল, 'ঐ যা! ইঁদুরটা নর্দমায় পড়ে গেল।' ঠুকে-মারি ভাবল, 'যার খোকা এরকম, সে নিশ্চয়ই আমার উপযুক্ত জুড়ি হবে।' বাড়ির সামনে একটা তাল গাছ ছিল, সেটা উপড়ে নিয়ে ঠুকে-মারি হেঁকে বলল, 'ওরে খোকা তোর বাবাকে বলিস যে আমার একটা ছড়ির দরকার ছিল, তাই এটা নিয়ে চললাম।'

খোকা তৎক্ষণাৎ বলে উঠল, 'ওমা দেখেছ? ঐ দুষ্টু লোকটা বাবার খড়কে কাঠি নিয়ে পালিয়ে গেল।' খড়কে কাঠি শুনে ঠুকে-মারির চোখ দুটো আলুর মতো বড় হয়ে উঠল। সে ভাবল, দরকার নেই বাপু, ওসব লোকের সঙ্গে ঝগড়া করে। সে তখনই হনহন করে সে গ্রাম ছেড়ে নিজের গ্রামে পালিয়ে গেল।

মুখে-মারি বাড়িতে এসে ছেলেকে জিজ্ঞাসা করল, 'কিরে! লোকটা গেল কই?' খোকা বলল, 'সে ঐ তাল গাছটা নিয়ে পালিয়ে গেল। এই কথা শুনে মুখে-মারি ভয়ানক রেগে বলল, 'হতভাগা! তুই আমার ছেলে হয়ে আমার নাম ডোবালি? দরকার হলে দুটো কথা বলতে পারিস নে? যা! আজই তোকে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে আসব।' এই বলে সে অপদার্থ ছেলেকে গঙ্গায় ফেলে দিতে চলল।

কিন্তু গঙ্গা তো গ্রামের কাছে নয়। সে অনেক দূর। মুখে-মারি হাঁটছে তো হাঁটছে আর ভাবছে, ছেলেটা যখন কান্নাকাটি করবে, তখন তাকে বলবে, 'আচ্ছা, এবার তোকে ছেড়ে দিলাম।' কিন্তু ছেলেটা কাঁদেও না, কিছু বলেও না। সে বেশ আরামে কাঁধে চড়ে গঙ্গায় চলেছে। তখন মুখে-মারি তাকে ভয় দেখিয়ে বলল, 'আর দেরি নেই, এই গঙ্গা এসে পড়ল বলে।' ছেলেটা চট্ করে বলে উঠল, 'হ্যাঁ বাবা। বড্ড জলের ছিটা লাগছে।' শুনে মুখে-মারির চক্ষুস্থির। সে তখনই ছেলেকে কাঁধ থেকে নামিয়ে বলল, 'শিগগির বল, সত্যি করে লোকটাকে তুই কিছু বলেছিস কিনা?'

ছেলে বলল, 'ওকে তো আমি কিছু বলিনি। আমি মাকে চেঁচিয়ে বললাম, দুষ্টু লোকটা বাবার খড়কে কাঠি নিয়ে পালিয়ে গেল।'

মুখে-মারি একগাল হেসে তার পিঠ চাপড়ে বলল, 'সাবাস্ ছেলে! বাপ্‌কা বেটা।'

রাজ্য পরিচিতি

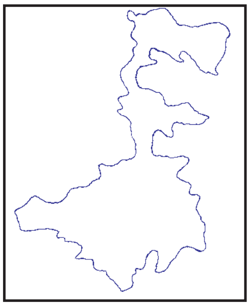

পশ্চিমবঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গ ভারতের পূর্বদিকে অবস্থিত। এই রাজ্যের আয়তন ৮৮,৭৫২ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা ৯ কোটি ১৩ লক্ষ ৪৭ হাজার ৭৩৬ জন (২০১১)। উনিশটি জেলা নিয়ে গঠিত এই রাজ্য। প্রাকৃতিক বৈচিত্রে ভরা এই রাজ্যের উত্তরে রয়েছে হিমালয় পর্বতমালা এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। মধ্যভাগ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে গঙ্গা নদী। এছাড়াও এখানকার অন্যান্য নদীগুলি হল তিস্তা, তোর্ষা, দামোদর, রূপনারায়ণ, কাঁসাই প্রভৃতি। সারা রাজ্যে ছড়িয়ে আছে বহু তীর্থস্থান। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কলকাতার কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর, বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও আকৃষ্ট করে পর্যটকদের। এর মধ্যে দার্জিলিং ও দীঘা অন্যতম। পশ্চিমঙ্গের সুন্দরবন বিশ্বের সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রেভ অরণ্য। সাংস্কৃতিক দিকেও নানা বৈচিত্র রয়েছে এরাজ্যে। যেমন— পুরুলিয়ার ছৌ-নাচ, বীরভূমের বাউল, কোচবিহারের ভাওয়াইয়া সঙ্গীত ইত্যাদি। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী।

প্রশ্নবাণ

১.যোজনা কমিশনের বর্তমান নাম কি?

২.ভারতের বর্তমান জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা কে?

৩.ইসরোর চেয়ারম্যান কে?

৪.বর্তমানে দেশে কতজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী আছেন?

৫.ভারতের একজন বাঙালি রাষ্ট্রপতির নাম কী?

উত্তর : ১. নীতি আয়োগ (২) অজিত কুমার দোভাল (৩) এ এস কিরণকুমার (৪) চারজন (৫) প্রণব মুখোপাধ্যায়।

ছবিতে অমিল খোঁজ

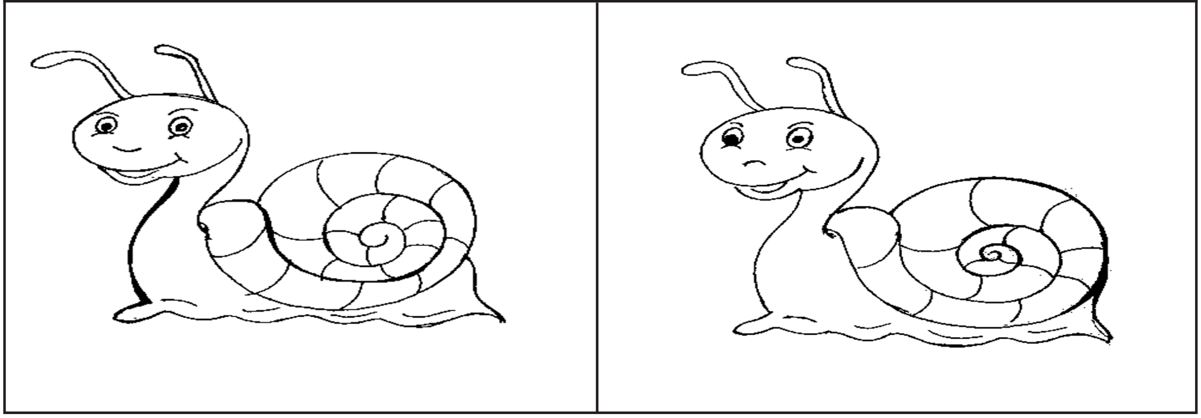

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) বী র ক র

(২) ন ং অ মা

২০ জুলাই সংখ্যার উত্তর

(১) খাতাকলম (২) তুলসীতলা

উত্তরদাতার নাম

অনুশ্রী হালদার, কলকাতা-৪৬

রিমি মণ্ডল, ঈশ্বরপুর, উত্তর দিনাজপুর

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) ম র ণি দা সা

(২) ব র মা ন কু

২০ জুলাই সংখ্যার উত্তর

(১) আকাশবাণী (২) রক্ষাকবচ

উত্তরদাতার নাম

দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য, কালনা, বর্ধমান

অনন্যা বক্সী, প্রণবানন্দ পল্লী, বাঁকুড়া

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : ৮৪২০২৪০৫৮৪
E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

কিশোরীবস্থায় মাতৃত্ব একটি অনাকাঙ্ক্ষিত বাস্তব

সুতপা বসাক ভড়

সম্প্রতি সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত যে, চণ্ডীগড়ে দুষ্কর্মের শিকার একটি বার বছরের মেয়ে হাসপাতালে একটি অবাঞ্ছিত সন্তানের জন্ম দেয়। আদালতে মেয়েটি এবং তার পরিবার গর্ভপাতের অনুমতির জন্য আবেদন জানিয়েছেন কিন্তু আদালত মত দেয়নি। কারণ মেয়েটির গর্ভাবস্থার ৩৪ সপ্তাহ হয়ে যাবার পরেই তার অভিভাবকেরা ঘটনাটি জানতে পারে। সরকারি আইনানুসার গর্ভাবস্থার ২০ সপ্তাহ পরে গর্ভপাত করানো নিষেধ। সুতরাং মেয়েটি বাধ্য হয় তার সন্তানকে জন্ম দিতে এবং আদালতে আবেদন করে যে সে তার সন্তানের তত্ত্বাবধানে অক্ষম। এই পরিস্থিতিতে মেয়েটি তার সন্তানকে হাসপাতালে রেখে বাড়ি ফিরে যায়। যতক্ষণ কোনো সহৃদয় পুরুষ বা মহিলা শিশুটির দায়িত্ব গ্রহণ করতে এগিয়ে আসবে না ততক্ষণ নবজাত শিশুটি অনাথ পরিচয়ে পরিচিত হবে আর তার হতভাগিনী মা দুষ্কর্মের শিকার হয়ে সারাজীবন অন্তর্দহনে জ্বলবে। মেয়েটির এই করুণ পরিণতির জন্য যে পাশব প্রকৃতির মানুষটি দায়ী, তাকে কি খুঁজে বের করে শাস্তি দেওয়া হয়েছে?

একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, গত ৬ থেকে ৮ বছরের মধ্যে সতেরো বছরের কম বয়সী মেয়েদের মধ্যে অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের ঘটনা প্রায় ৫০ শতাংশ বেড়ে গেছে। বালিকা-কিশোরীদের এই করুণ অবস্থার জন্য কয়েকটি মুখ্য কারণ হল—(১) দুষ্কর্মের শিকার, (২) অহেতুক শারীরিক কৌতূহল এবং (৩) বাল্যবিবাহ। একথা আমরা অস্বীকার করতে পারি না যে, যে বয়সে মেয়েরা খেলা-ধুলা, পড়াশুনা করে জীবনের পথে এগিয়ে যাবে, ওইসময় এই অনাকাঙ্ক্ষিত মাতৃত্বের বোঝা তাদের জীবনের সব স্বপ্ন-আনন্দকে শেষ করে দেয়। অনেকসময় দুষ্কর্মের শিকার মেয়েটি ভয়ে-লজ্জায় অভিভাবকদের কিছুই জানায় না। তাঁরা যখন জানতে পারেন, তখন অনেক দেরি হয়ে যায় আর ঘটনাগুলির পুনরাবৃত্তি হয়—দুষ্কৃতকারীও শাস্তি পায় না। কয়েকজন চিকিৎসক জানিয়েছেন যে আগে মাসে এক-আধজন কিশোরী আসত গর্ভপাত করাতে, এখন মাসে ২-৩ জন আসে (প্রাইভেট হাসপাতালে)। এদের মধ্যে বেশিরভাগই আসে পুরুষসঙ্গী বা বান্ধবীর সঙ্গে। গুড়গাঁও-এ নার্সিং হোমে একটি মেয়ে ছ'মাসে তিনবার গর্ভপাত করিয়েছে তার পুরুষসঙ্গীর সঙ্গে এসে। এ প্রসঙ্গে ডাক্তারবাবু জানিয়েছেন যে তিনি মেয়েটিকে সাবধান করেছেন যে এরকম করতে

অঙ্গনা

থাকলে ভবিষ্যতে তার মা হবার সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যাবে, কিন্তু অস্থিরচিত্ত মেয়েটি শুধুমাত্র তার বর্তমান অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিল। এইরকম শহরের অনেক নামি-দামি স্কুলের মেয়েরা সেখানে আসে যাদের পরিবার উচ্চশিক্ষিত এবং ধনী। ওই মেয়েদের ওই পরিণতির জন্য অনেকক্ষেত্রে তারা নিজেরাই দায়ী। পশ্চিমের উত্তাল আধুনিকতা আর উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রায় গা-ভাসিয়ে দেওয়া নতুন প্রজন্মের কাছে নৈতিকতার কোনো মূল্য নেই।

ঘটনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন যে টেলিভিশন, ইন্টারনেট-এর জন্য আজকাল বাচ্চারা অনেক তাড়াতাড়ি বড়ো হয়ে যাচ্ছে। তার ওপর পরিবার থেকে যথেষ্ট সময়, ভালোবাসা, সমবেদনা, আদর-যত্ন না পাওয়ায় তারা বিপথগামী হয়ে যাচ্ছে। যৌনশিক্ষার প্রয়োজন আছে বলে অনেকেই এপ্রসঙ্গে মতামত জানিয়েছেন। কিন্তু আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে বৃটেন, আমেরিকার মতো পশ্চিমের দেশগুলিতে অনেক নীচু ক্লাস থেকে ওই শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহলে তাদের দেশেও বালিকা-কিশোরী মাতৃত্বের হার কেন দিনে দিনে বেড়ে চলেছে? কেনই বা ওইসব দেশের সমাজবিদ, পুলিশ, রাজনীতিজ্ঞ, আইনজ্ঞ—সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষ এত চিন্তিত? সুখের কথা, তাঁরা এই সমস্যার সমাধানের জন্য পরিবারতন্ত্রে ফিরে আসতে চাইছে। তাঁদের বক্তব্য, কিশোর-কিশোরীরা একাকিত্বের শিকার হয়ে অবাধ মেলামেশা করছে তার ফলস্বরূপ তারা নিজেরাই বাল্যাবস্থায় ডেকে আনছে বিপত্তি।

আমাদের দেশে বাল্যবিবাহ আইনত নিষিদ্ধ, তবে একথাও ঠিক যে আইনের ফাঁক দিয়ে এখনও বাল্যবিবাহ হচ্ছে। আশার কথা, সমাজের মানুষ এখন অনেক বেশি সচেতন এবং অনেকক্ষেত্রেই কোনো সজ্জন বা কনে নিজেই পুলিশের কাছে সাহায্য চায়। সেক্ষেত্রে পুলিশ ও আইন তাকে সাহায্য করে।

কিশোরীরা যারা দুর্ভাগ্যবশত এই অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের শিকার হচ্ছে তাদের পাশে দাঁড়ানোর, তাদের সাহায্য করার জন্য তার পরিবারের লোকেদের এগিয়ে আসতে হবে। বাড়িতে অনুকূল পরিবেশ থাকলে তারা অকপটে তাদের অনভিপ্রেত অবস্থার কথা অভিভাবকদের জানাতে পারবে। ফলে তারা অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের হাত থেকে রেহাই পাবে। শুধু তাই নয়, দুষ্কর্মকারীকে চিহ্নিত করে তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারেও মেয়েটি সাহায্য করবে।

যারা নিজেদের উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য এই বিপদ ডেকে আনছে—তাদের সম্পর্কেও একই কথা। অফুরন্ত আদর ভালোবাসা দিয়ে ভরে দিতে হবে ওইসব বালক-বালিকা ও কিশোর-কিশোরীদের। একাকিত্বের হতাশাজনিত রোগের শিকার যাতে না হয় তা দেখার দায়িত্ব অবশ্যই অভিভাবকদের। তাদের পাশে থেকে বুঝিয়ে দিতে হবে—এই কৈশোর হলো জীবনের একটি মহামূল্যবান অধ্যায়। নিজেকে তৈরি করার সময়।

খেলাধুলা- পড়াশুনা করে নিজেকে একজন সচেতন নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলাই তাদের কর্তব্য। এই স্বপ্ন সার্থক হলে আমাদের দেশে কোনো কিশোরীর অবাঞ্ছিত সন্তানের হবে না এবং কৈশোরের অনাকাঙ্ক্ষিত মাতৃত্বের হাত থেকে রক্ষা পাবে আমাদের পরিবারের মেয়েরা। ■

বাংলার মেয়ে : টুকটুকি মণ্ডলের করুণ কাহিনি

অতিথি কলম

কাঞ্চন গুপ্ত

মুসলমান গুণ্ডাদের হাতে নির্যাতিত হওয়ার ক্রমবর্ধমান তালিকায় নবতম সংযোজন বাংলার গ্রামাঞ্চল থেকে টুকটুকির অপহরণ ও ধর্ষণ। হায়! না শাসক না বিরোধী সাহায্যের দরজা কারুরই খোলা নেই।

তথাকথিত ২৪ ঘণ্টা সজাগ মূলধারার মিডিয়ার কৃপায় আক্ষরিক অর্থেই ২৪ ঘণ্টা বাংলার তরুণী মেয়েদের অপহরণ, ধর্ষণ ও বহুক্ষেত্রে ব্যবসার উদ্দেশ্যে পাচার হয়ে যাওয়ার খবর— এখন হয়ত আর তাদের শীর্ষ সংবাদ হওয়ার যোগ্যতা পায় না।

যদি বা কখনও কখনও সংবাদদপ্তরে এই সমস্ত খবর পরিবেশন করা জরুরি মনে করে সেক্ষেত্রে কেবলমাত্র অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বা মানসিক বিকারগ্রস্ত কোনো ঘটনা ঘটলে তার সবিস্তার

টুকটুকিকে দুষ্কৃতীদের হাত থেকে উদ্ধারের দাবিতে ধর্নায় বলেছে রাজ্য বিজেপি।

বিবরণ বাজারী-ভাষায় পাঠকদের খাওয়ানো হয়। সংবাদপত্রের মূল স্তম্ভগুলি রাজ্যে চালু থাকা রাজনৈতিক তামাশাগুলিকেই মহাগুরুত্বে পাঠককে উপস্থাপন করে, তারাও এই সস্তা উত্তেজনাগুলিই আজকাল খুঁজে বেড়ায়। সঠিক তথ্যসমৃদ্ধ খবর পড়ার রুচি তাদের নষ্ট হয়ে গেছে।

এই পটভূমিতেই সেই মেয়েটি যাকে তার বাবা-মা আদর করে নাম রেখেছিল 'টুকটুকি', যখন গত মে মাস থেকে নিখোঁজ হয়ে গেল (অপহৃত হলো) এবং আরও যে নিখোঁজ তার কোনো খবর এমনকী সংক্ষিপ্ত আকারেও কোনো টুকরো সংবাদ না বৈদ্যুতিন মাধ্যম না খবরের কাগজ কোথাওই উল্লেখিত হলো না। তাই হতভাগ্য মেয়েটির হৃদয়বিদারক কাহিনি ও তার অভিভাবকদের ততোধিক মর্মবেদনা যাতে অন্তত কোথাও লিপিবদ্ধ থাকে তাই প্রতিবেদনটির উপস্থাপনা।

টুকটুকি দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট থানার অন্তর্গত একটি স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্রী। গত ২৫ ফেব্রুয়ারি বাড়ি ফেরার পথে সে একবার স্থানীয় ব্যাঙ্কে তার হিসেবের খাতাটি দেখতে গিয়েছিল। ব্যাঙ্ক থেকে বেরোনোর পরই অপহৃত হয়। মেয়েটির বাবা দিন মজুর সুভাষ মণ্ডলের বয়ান অনুযায়ী 'সেলিম' নামের এক মুসলমান গুণ্ডার পরিচালিত একটি দলের ৩ জন সমাজবিরোধী তাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। শোনা যাচ্ছে সেলিম নামের এই মুসলমান গুণ্ডা সর্দার শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের আস্থাভাজন। অন্য বহু গুণ্ডাদের মতো সেও আগে সিপিএম-এর মদত পেত, এখন সকলের মতো সেও ২০১১ থেকে 'মা-মাটি-মানুষ' হয়ে গেছে।

ঘটনার পর মেয়েটির নিরুপায় বাবা স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধানের দ্বারস্থ হলে তিনি পুলিশে যোগাযোগের বিধান দেন। সুভাষ মণ্ডল মগরাহাট থানায় একটি পিটিশন দাখিল করে। কিন্তু কিছুই ঘটে না। হঠাৎ ৭ মার্চ সেলিমের লোকজন তাকে 'বাবুসোনা গাজী' নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে ডেকে পাঠায়। গাজীবাবুর বাড়িতে পৌঁছে মেয়েটির বাবা তাজ্জব হয়ে দেখে সেখানে নানান অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে জনা পঞ্চাশেক খুনে লোকজন উপস্থিত রয়েছে। সেখানেই তাকে পুলিশ এজাহারটি প্রত্যাহার করতে চাপ দেওয়া হয়। স্বাভাবিকভাবেই নিজের মেয়ের নির্যাতনকারীদের দেওয়া শর্তগুলি তিনি মানতে রাজি হননি।

মণ্ডল জানান গুণ্ডাবাহিনী কেবলমাত্র পুলিশ অভিযোগ ও মেয়ের ডাক্তারি পরীক্ষার আবেদন তুলে নিলে তবেই মেয়ের সঙ্গে দেখা হতে পারে এই শর্ত দেয়। এই সঙ্গে তারা বেশকিছু সাদা কাগজে তাকে সই করবার আদেশ দেয়। গুণ্ডারা এরপর সুভাষ মণ্ডলের মেয়ের বিয়েতে সাহায্যেরও আশ্বাস দেয়। অবশ্য সই না করলে যে টুকটুকিকে আর ফেরত পাওয়া যাবে না সে হুমকিও দিয়ে রাখে। শ্রীমণ্ডল মেয়ের মঙ্গল চিন্তায় সব সাদা কাগজে সই করে দেয় ও মেয়েকে ফেরত পায়। মেয়েটির মা চরম হতাশার সঙ্গে জানাচ্ছে তাঁর মেয়েটি উপর্যুপরি নানান বয়েসের লোকজন দ্বারা ধর্ষিত হয়েছে।

এই সমস্ত খবর সুভাষ মণ্ডলের পরিবারের পক্ষে সমর্থন জোগাড়ের আশায় গুগুল হ্যাং আউট থেকে পাওয়া গেছে যাতে অকর্মণ্য জেলা প্রশাসন তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোনো উপযুক্ত পদক্ষেপ নেয়।

গুগুলে পাওয়া টুকুটুকির বাবার বয়ানটি হুবহু দেওয়া হচ্ছে :

''ঘটনার পর ৯ মার্চ মেয়েটির বাবা মগরাহাট পুলিশ চৌকিতে অভিযোগ লেখাতে গেলে তদন্তকারী অফিসার তাকে কিছু সাদা কাগজে সই করতে বাধ্য করেন। এরপর তাঁর অপহৃত মেয়ের ডাক্তারি পরীক্ষা করার তোড়জোড় হতেই সেখানে গুণ্ডা সর্দার সেলিম ও তার দলবলের উপস্থিতি তাঁর নজরে পড়ে। তারা খোলাখুলিই ছুরিছোরা বের করে মেয়েটিকে পুলিশের উপস্থিতিতেই ভয় দেখাতে থাকে। আতঙ্কিত মেয়েটি তাদের কথামতো কাগজে সই করে দেয় যাতে লেখা ছিল যে ডাক্তারি পরীক্ষা করাতে চায় না।

গুণ্ডাদের ব্যবহারে সন্ত্রস্ত আতঙ্কিত মেয়েটির বাবা-মা ৭ মার্চের কথামতো মেয়েটির বিয়ে দিতে রাজি হয় যাতে গুণ্ডাবাহিনীর সাহায্য করার কথা ছিল। যদিও মেয়েটি তখনও নাবালিকা। মেয়ের বাবা পঞ্চায়েত প্রধানকে খবরটা জানান। তিনি অভিযুক্তদের একজনের দাদাকে খবরটা দেন যারা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

হায়! ৫ মে রাত ১ টার সময় মূল অভিযুক্ত তার বাবা ও ভগ্নিপতিকে সঙ্গে নিয়ে মেয়েটির বাড়ি চড়াও হয়। গোটা এলাকার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে বাড়িতে ব্যাপক লুটপাট চালায়। বন্দুকের নলের মুখে হতভাগ্য মেয়েটির বাবা তার বিয়ের জন্য যা সোনা-দানা, টাকা-পয়সা যোগাড় করেছিল সবই লুটপাট করে নেয়। শেষাবধি তারা টুকটুকিকেও আবার সঙ্গে নিয়ে যায়। কিংকর্তব্যবিমূঢ় আত্মীয়স্বজন সাহায্যের জন্য চীৎকার করলে তারা বোমা ছুঁড়তে ছুঁড়তে চলে যায়।

নিরুপায় সুভাষ মণ্ডল ৫ তারিখে সকালে আবার মগরাহাট থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে পুলিশ মূল অভিযুক্তদের নাম বাদ দিয়ে দু' একজন অজানা লোকের নাম ঢুকিয়ে দেয়। শ্রীমণ্ডল প্রতিবাদ করলে তাঁরা তাকে আবার সাদা কাগজে সই করতে বলেন নইলে তিনি আর মেয়েকে দেখতে পাবেন না এমনই হুমকি দেয়। এরপর তিনি বহুবার নিষ্ফলাভাবে থানায় ঘুরেছেন। ইতিমধ্যে সেলিম ও অভিযুক্তদের ক্রমাগত হুমকি জারি আছে। মেয়েও ফেরত আসেনি।

হতাশ, হতমান মণ্ডল এবার কোনোমতে কলকাতায় এসে হিন্দু সংহতির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক তপন ঘোষের কাছে আশ্বাস পান। তপনবাবু তাঁকে সরাসরি প্রধানমন্ত্রী ও বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

এরপর গত ২১ জুন শ্রীমণ্ডল হঠাৎ এক অপরিচিত ব্যক্তির ফোন পান যেখানে তাঁকে সোনারপুর গিয়ে মেয়ে ফেরত পাওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়। মণ্ডল কিছু আত্মীয় ও হিন্দু সংহতির কয়েকজন সদস্যকে নিয়ে ওখানে পৌঁছেই আবার ঘুটিয়ারী শরিফে চলে যাওয়ার ফোনাদেশ পান। প্রসঙ্গত এই জায়গাটি কুখ্যাত মুসলমান গুণ্ডাদের বিচরণক্ষেত্র। বাবার প্রাণ— সমস্ত ঝুঁকি নিয়ে ঘুটিয়ারীতে পৌঁছে দেখেন সেই মগরাহাটের তদন্তকারী অফিসার জীবনতলা থানা থেকে কিছু পুলিশ নিয়ে সেখানে আগেই চলে গেছেন। কীভাবে তিনি খবর পেয়েছিলেন তা মণ্ডলের অজানা। যাই হোক, নির্দিষ্ট জায়গাটা ছিল দোহাঘাটা মসজিদ লাগোয়া। কিছুক্ষণ পর পুলিশ হঠাৎ চলে যেতেই শয়ে শয়ে লোক মসজিদ থেকে বেরিয়ে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ব্যাপক মার খান হিন্দু সংহতির লোকজন। কোনো দিক থেকে কোনো সাহায্য না পেয়ে তাঁরা পালাতে বাধ্য হয়।

মেয়ের শোকে মরিয়া শ্রীমণ্ডল এরপর হিন্দু সংহতির সাহায্যে কলকাতা উচ্চ আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন। পুলিশ ও প্রশাসনের চরম অপদার্থতাকে ধিক্কার জানিয়ে বিচারক আগামী ২৭ জুলাই টুকটুকি মণ্ডলকে কোর্টে উপস্থিত করার আদেশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অপরাধীদেরও গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দিয়েছেন। অবশ্য বিচারকের আদেশ এই পুলিশবাহিনী মান্য করবে কিনা তা এখন দেখার।

এই মর্মান্তিক ঘটনাটির পূর্বাপর পর্যালোচনা করলে তিনটি বিষয় উঠে আসছে :

প্রথমত, রাজ্যের সেই সমস্ত অঞ্চলগুলিতে যেখানে যত বেশি বাংলাদেশি বেআইনি অনুপ্রবেশের ফলে মুসলমান জনসংখ্যার ব্যাপক বৃদ্ধি হয়েছে সেখানেই হিন্দু মেয়েদের জোর করে অপহরণ, ধর্ষণ ও জবরদস্তি বিয়ে করে নেওয়ার ঘটনা বেড়ে চলেছে। আপাতভাবে শুনতে বাড়িয়ে বলা মনে হলেও হিন্দু সংগঠনের কর্মীদের মতে বহু জায়গায় পরিস্থিতি প্রায় পাকিস্তানে বসবাসকারী হিন্দুদের মতো দুরবস্থার জায়গায় গিয়ে ঠেকেছে। হিন্দু সংহতির তপন ঘোষ এই মর্মে আমাকে বলেন যে, মুসলমানদের হাতে নিগৃহীত হিন্দুদের বেশিরভাগই খুব গরিব ও অসহায়। বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ নিত্যদিন বেড়ে চলায় হিন্দু জনসংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। যাদের অত্যাচারিত এলাকাগুলি ছেড়ে যাবার সঙ্গতি নেই তারা সকলেই 'সেলিমের' লালসার শিকার হচ্ছে। তপনবাবুর বয়ান অনুযায়ী বহু জায়গায় হিন্দুদের অনুপাত ৫০ শতাংশের নীচে নেমে গেছে। বাংলা জুড়ে যে মুসলমান আধিপত্যবাদ আজ ভয়ঙ্করভাবে মাথা চাড়া দিয়েছে তার মূলে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর মুসলমান দরদি দল তৃণমূল।

দ্বিতীয়ত, যদি ধরেও নেওয়া যায় বাংলার প্রশাসন এই পরিস্থিতির পরিবর্তন করতে চায় তার কোনো প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না। অনুপ্রবেশ বন্ধ করা বা সীমান্তের গ্রামাঞ্চল থেকে হিন্দুদের গৃহত্যাগ আটকানো বা মুসলমান আধিপত্যবাদে লাগাম পরানো এর কোনোটাতেই প্রশাসন কড়া হাতে মোকাবিলা করতে চায় না। কেননা তারা তৃণমূলি গুণ্ডাদের ভয়ে আতঙ্কিত। আর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তো মুসলমান ভোটের দয়ায় গদিতে বসে আছেন। তাই ভাগ হয়ে থাকা হিন্দু জাতভাইদের জন্য তাঁর কোনো মাথাব্যথা নেই।

তৃতীয়ত, রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বের এখন সেই কংগ্রেসকে দেওয়া 'বাইরে সবুজ ভেতরে লাল' তরমুজের তকমা অচল। তাঁরা হয়তো সবটাই সবুজ হয়ে পড়েছেন। ভাবা গিয়েছিল সিপিএম যেমন এখনও মুসলমান ভোট ফিরে পাওয়ার আশা রাখে, বিজেপি নিশ্চিত হিন্দুদের কেন্দ্রীভূত করবে। সেসব হয়নি। ২০১৪ সালের লোকসভায় নরেন্দ্র মোদীর অভূতপূর্ব সাফল্যের সঙ্গে রাজ্যের যে হিন্দু ভোট মেরুকরণের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল তা বিলীন হয়ে যাচ্ছে। টুকটুকি মণ্ডলের অপহরণের দিনই কি দলের বিষয়টি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে সুযোগের সদ্ব্যবহার করার প্রয়োজন ছিল না?

(লেখক বিশিষ্ট স্তম্ভলেখক)।

ওয়াহাবির উত্থান

আতঙ্কের যুগ কি আসতে চলেছে?

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ‘ওয়াহাবি’ একটি আরবি শব্দ যার অর্থ পুনর্জাগরণ, পরিষ্কার করে বলা ভালো ইসলামের পুনর্জাগরণ বা নবজাগরণ। ‘ওয়াহাবি’ মতবাদে বিশ্বাসীরা অতি কঠোরভাবে কোরান ও হাদিস বর্ণিত পথে তাদের জীবনকে চালিত করে। তাই বলাই বাহুল্য এই মতবাদে বিশ্বাসীরা বা ইসলামের এই গোষ্ঠীর লোকেরা অতি চরমপন্থী, গোঁড়া ও মৌলবাদী মানসিকতার হয়ে থাকে। অষ্টাদশ শতকে আরবে উদ্ভূত এই মতবাদ বর্তমান বিশ্বে মুসলমান সমাজের মধ্যে পুনরায় প্রবলভাবে জনপ্রিয় হচ্ছে। বিশ্বজুড়ে ইসলামের ক্রমবর্ধমান তাণ্ডব ভারতবর্ষসহ পৃথিবী জুড়েই গোঁড়া ওয়াহাবি মতবাদের পুনর্জাগরণকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। সম্প্রতি টিউনিশিয়া, কুয়েত, ফ্রান্স, ইরান, ইরাকের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী ‘ওয়াহাবিজম্’-এর উত্থানের আদর্শ নিদর্শন। ‘উইকিলিকস্’ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে একটি মুখ্য আরবীয় তেল উত্তোলনকারী দেশ প্রায় ১৭০০ কোটি টাকা ভারতে শিক্ষা ও ধর্ম (যদিও আদতে এটি একটি মতবাদ) প্রচারের মোড়কে ইসলাম প্রসারে ব্যয় করছে। যদিও প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা বিবেচনার মধ্যে রাখতে হবে যে মুসলমান সমাজের মধ্যে সকলেই এই মতবাদের অনুসারী নয় বা আক্রমণাত্মক নয়। তবুও এটা অনস্বীকার্য যে সন্ত্রাসবাদীরা ইসলামকেই (মূলত ধর্মান্তরের মাধ্যমে) তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তারে ব্যবহার করছে। সম্প্রতি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পিউ রিসার্চ সেন্টার-এর একটি প্রতিবেদনে প্রকাশিত--- পৃথিবীতে দ্রুততম হারে ইসলামের প্রসার ঘটছে এবং ২০৭০ সালের মধ্যে বর্তমান বিশ্বের বৃহত্তম খৃষ্ট মতবাদকে সরিয়ে ‘ইসলাম’ তার স্থান দখল করবে। এইটিই একমাত্র মতবাদ, যার বৃদ্ধির হার মানব বৃদ্ধির হারকেই হার মানাচ্ছে। আগামী ২০৫০ সালের মধ্যে ইসলাম মতাবলম্বীদের সংখ্যা পৃথিবীতে সবথেকে বেশি হবে। ২০৩০ সালের মধ্যেই ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে সবথেকে বৃহৎ মুসলমান আবাসস্থলে পরিণত হবে এবং ভারতের মোট জনসংখ্যার ১৮-১৯ শতাংশ অধিকার করবে।

ওয়াহাবির আদর্শে মুসলমান যুবকরা।

তাই এই বিপুল সংখ্যক ধর্মান্ধ মুসলমান যুবকদের দলে টানতে উদ্যত হয়েছে পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী। অতীতের মতো বর্তমানের সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলি যেমন আইসিস, বোকো হারাম মুসলমান যুবকদের প্রলোভিত করে দলে টানতে যৌন ক্রীতদাসী, অর্থ এবং অন্যান্য দ্রব্যের লোভ দেখাচ্ছে। এইভাবে চলতে থাকলে এটা শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা যে ভারতীয় মুসলমান যুবকরাও এই সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলির শিকারে পরিণত হয়ে যাবে।

যদিও ভারতীয় মুসলমানরা মধ্যপ্রাচ্যে বসবাসরত তাদের স্বধর্মীয়দের মতো এখনও পর্যন্ত মৌলবাদী হয়ে ওঠেনি কিন্তু তবুও এই ধর্মীয় উত্থানের ছোঁয়াচ থেকে ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়কে বাঁচাতে শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা প্রয়োজন, পরিবার পরিকল্পনা করা প্রয়োজন এবং আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার সঙ্গে তাদের পরিচিত করানো প্রয়োজন। সর্বোপরি অর্থনৈতিকভাবে উন্নত করার প্রয়োজন। ভারতের ইসলামিক মতাবলম্বী নেতাদের এবিষয়ে সংকীর্ণ মানসিকতা ছেড়ে মুসলমান অধিবাসীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্রতী হতে হবে। তবেই ভারতীয় মুসলমান সমাজকে ‘ওয়াহাবি’ উত্থানের ছোঁয়াচ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা যাবে। তবে এর পাশাপাশি আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ভারত সরকারকে নেওয়ার প্রয়োজন আছে। তা হলো ভারতে যে সকল উগ্রবাদী সংগঠন আছে বা যারা ভারতবর্ষে ইসলামি মৌলবাদ আমদানি করতে উদ্যত তাদের বিদেশ থেকে আগত অর্থ প্রবাহকে রদ করে দিতে হবে। কথায় আছে অর্থই অনর্থের মূল। তাই ভারতে আগত পেট্রোডলার আগমনের পথটি যদি রুদ্ধ করা যায়, তার ফলস্বরূপ ইসলামিক মৌলবাদী ভাবনা আপনা আপনিই স্তিমিত হয়ে যাবে। না হলে শুধুমাত্র ভারতবর্ষ নয়, এর প্রভাব ভারত-সহ সমগ্র এশিয়াতে ছড়িয়ে পড়বে এবং শান্তি ও উন্নতির বাতাবরণকে ব্যাহত করবে। ■

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে প্রাণীবিজ্ঞান

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার (জেড এস আই) শতবর্ষ উদ্‌যাপনের প্রাক্কালে বৈদিক যুগ ও তার পূর্ববর্তী সময়কালের উন্নত প্রাণীবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় জ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা করলেন জেড এস আই-এর নির্দেশক কে. বেঙ্কটরামন। তাঁর মতে প্রাণীবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বৈদিক ও প্রাক্ বৈদিক যুগে যা আবিষ্কৃত হয়েছে তার তুলনায় জেড এস আই-এর অবদান খুবই নগণ্য। বালুচিস্তান, সিন্ধু, পাঞ্জাব থেকে খননপ্রাপ্ত বিভিন্ন প্রকারের পশুপাখি অঙ্কিত সিল, টেরাকোটা, মাটির মূর্তি, মাদুলি বা তাবিজ, মৃৎপাত্র প্রমাণ করে যে প্রাক্ বৈদিক যুগের প্রাণীবিদ্যা চর্চার মান বেশ উন্নত ছিল। এমনকী এই সময়কালের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন কুঁজবিশিষ্ট বলদ জেড এস আই-এর পরিচয়জ্ঞাপক চিহ্ন (Logo) হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বেঙ্কটরামনের কথানুসারে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বৈদিক যুগের বহু গ্রন্থে বিভিন্ন পতঙ্গ ও প্রাণীর শ্রেণীবিভক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। ঋক বেদেই ২১ প্রকার ময়ূরী ও ঘোড়ার ৩৪টি পাঁজরের হাড়ের উল্লেখ আছে। এছাড়া ভারতীয় মহাকাব্য রামায়ণ, মহাভারতে বিভিন্ন প্রকার পতঙ্গ, সরীসৃপ, মাছ, পাখির কথা লেখা আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে সমগ্র জীবকুলকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। চরক, সুশ্রুত, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে মৎস্যকুল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও দক্ষিণ ভারতীয় সাহিত্য তামিল সঙ্গম ও বিভিন্ন ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনিতে প্রাণীবিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রচুর তথ্য রয়েছে। গত বছর ১০২ তম ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসে সংস্কৃত সাহিত্যে প্রাচীন বিজ্ঞান শীর্ষক আলোচনাচক্রে পৌরাণিক কাহিনিতে বিজ্ঞানের উপস্থিতি অবলম্বনে প্রবল বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়েছিল। যার থেকে প্রমাণ হয় এখনও অনেক সংখ্যক বিজ্ঞানী আছেন যারা পৌরাণিক কাহিনিতে বিজ্ঞানের উপস্থিতিকে সমর্থন করেন। প্রাচীন ভারতীয়দের বিজ্ঞানে

জি এস আই-এর ডিরেক্টর কে বেঙ্কটরামন। নীচে জি এস আই-এর প্রতীকচিহ্ন

অভিরুচির বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বৈদিক যুগে লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থে। বিভিন্ন গবেষণাসূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী নরেন্দ্র মোদী দাবি করেছেন যে আধুনিক যুগে চিকিৎসার যে বহুবিধ দিক যেমন ইন-ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন, কসমেটিক সার্জারি ভারতে প্রায় হাজার হাজার বছর আগেই প্রচলিত ছিল। এমনকী গ্রহান্তরে যাওয়ার যানও আবিষ্কৃত হয়েছিল। বর্তমানে বিজ্ঞানের কল্যাণে আমরা সবাই জানি যে জল প্রাণের উৎস কিন্তু আজ থেকে হাজার হাজার বছর পূর্বেই আমাদের পূর্বপুরুষরা প্রাণ সৃষ্টির এই গূঢ় কথাটা জেনেছিলেন আর তাই এই সত্যের আধারেই রচনা করেছিলেন সমুদ্র মন্থনের পৌরাণিক আখ্যান যেখানে বিষ্ণুর এক অন্যতম অবতার কূর্মের পৃষ্ঠে মন্দার পর্বত ও বাসুকি নাগের সাহায্যে সমুদ্র মন্থনের ফলে জল থেকে উঠে এসেছিল বহুবিধ প্রাণী ও অমূল্যরত্ন। অমূল্য রত্ন— কারণ সমুদ্র হলো রত্নাকার। বহুবিধ রত্নের ভাণ্ডার সঞ্চিত রয়েছে এর তলদেশে। যদিও এগুলি ছিল সত্যের প্রতীকি উপাসনা। কিন্তু প্রকৃতি সম্বন্ধে কোনো সম্যক জ্ঞান না থাকলে এই প্রকারের কাহিনি রচনা করা সম্ভব নয়। কারণ কাহিনি সে যে প্রকারই হোক না কেন কাল্পনিক বা অতি বাস্তব সেখানে কোথাও না কোথাও বাস্তবতার ছোঁয়া থাকেই। তাই শতবর্ষ উপলক্ষ্যে জেড এস আই-য়ের নির্দেশক কে. বেঙ্কটরামন ভাস্কর্যের মাধ্যমে সমুদ্র মন্থনকে খচিত করার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন বিখ্যাত শিল্পী ভবতোষ সুতারের উপর। আর শ্রী সুতারও তাঁর মনের মাধুরী মিশিয়ে সৃষ্টি করেছেন এক অনন্যসাধারণ শিল্পকর্ম— 'জীবনধারা'। ব্রোঞ্জের তৈরি এই ভাস্কর্যে তরঙ্গের উপর একটি শামুককে মন্থনপাত্ররূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে এবং জলজ প্রাণীরূপে মাছ ও কুমির সেখানে অবস্থান করছে। আর বাসুকী নাগ জল ও স্থলের সংযোগকারীরূপে নির্মিত হয়েছে। এছাড়া স্থলে প্রাণের অস্তিত্ব বোঝাতে রয়েছে গিরগিটি, রাজহাঁস, গোরু, ছাগল, হাতি ও জেড এস আই-এর প্রতীকচিহ্ন কুঁজবিশিষ্ট বলদ এবং সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে ডানা মেলে থাকা ঈগল। জেড এস আই-এর ডেপুটি ডিরেক্টর ধৃতি ব্যানার্জি জানিয়েছেন যে শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য নরেন্দ্র মোদীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। ■

বিশেষ নিবন্ধ

হিন্দু, ইসলাম ও খৃষ্টান ধর্মতত্ত্বে নারীর তুলনামূলক অবস্থান

অনসূয়া চন্দ

“নারীর অধিকার নিয়ে ইদানীং বহু মানুষ সরব হয়েছেন। এদের মধ্যে সমাজকর্মী, সাংবাদিক থেকে শুরু করে কলেজ অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাও রয়েছেন। তাদের অনেকেই আবার ভারতীয় বিশেষত হিন্দু চিরাচরিত ঐতিহ্যকে নানা প্রসঙ্গে তুলোধুনো করেন। তাঁরা দয়া করে হিন্দুধর্মকে গালাগালি করার পূর্বে হিন্দু ধর্মশাস্ত্র ও তার পাশাপাশি খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্মশাস্ত্রগুলি যদি পাঠ করেন তবে সবারই মঙ্গল।”

হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে নারী আদ্যাশক্তি মহামায়ার মূর্ত প্রতীকরূপে পূজিতা হন। প্রাচীন যুগ থেকেই ভারতীয় নারী তার সৌন্দর্য ও স্বভাবগত মাধুর্যের পাশাপাশি বিভিন্ন শাস্ত্র, অস্ত্রবিদ্যা ও চারুকলায় নিজ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছে। পাশ্চাত্যে জ্ঞান-দীপ্তির বহু পূর্বে এ দেশের নারীর মনন ও মনীষা আলোকিত করেছে এশিয়ার কৃষ্টিকে। বৈদিক যুগের ব্রহ্মবাদিনী গার্গী, ঘোষা, বিশ্ববরা, আপালা প্রমুখের নাম এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। তাঁরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ না হয়ে সংসারজীবনে প্রবেশ না করে সারা জীবন কেবল জ্ঞানচর্চাতেই অতিবাহিত করেছেন। বৈদিক ঋষিদের পাশাপাশি এই মনস্বিনী নারীদের অনেকেই সংস্কৃত ভাষায় বহু মন্ত্র ও শ্লোক রচনা করেছেন। রামায়ণে রানী কৈকেয়ী দেবাসুর সংগ্রামে রাজা দশরথের সারথির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। মহাভারতে সুভদ্রা শুধু অর্জুনের রথের সারথিই হননি, প্রয়োজনে অস্ত্রচালনাও করেছেন। হিন্দুধর্ম নারীদের প্রতি এতটাই উদার ছিল! যদি আমরা খৃষ্টান সম্পর্কে কী কী বলা হয়েছে সেগুলি এর পাশাপাশি আলোচনা করি তবে এই ঔদার্যের বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়।

কোরান বা হাদিসে নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তেমন কিছু উল্লেখ করা হয়নি।

দ্বাদশ শতকের বিখ্যাত সুন্নি পণ্ডিত ইবন আসাফিরের রচনায় সে যুগে আরবে নারীশিক্ষার বিষয় সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন যে, নারীরা লেখাপড়া শিখতে পারে, ইজাজাহ অর্থাৎ ধর্মশিক্ষা সম্পর্কিত ডিগ্রি বা উপাধি লাভ করতে পারে এবং ইসলামের শিক্ষিকা বা উলেমারূপে যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। এখানে প্রশ্ন ওঠা খুবই স্বাভাবিক যে, নারীর বিদ্যালাভ কি কেবলমাত্র ধর্মগ্রন্থের সীমিত পরিসরেই আবদ্ধ থাকবে? বাইবেলের ১ম করিন্থীয়ানে বলা হয়েছে যে, স্ত্রীলোকেরা যদি কিছু শিখতে চায় তবে তারা ঘরে নিজেদের স্বামীর কাছে তা জিজ্ঞাসা করুক, কারণ সমাবেশে কথা বলা স্ত্রীলোকের পক্ষে লজ্জার বিষয়। অথচ ভারতে কত প্রাচীন আমলে জনকরাজার সভায় আমরা যাজ্ঞবল্ক্য ও গার্গীর বিখ্যাত তর্কের কথা শুনেছি।

খৃষ্টান ও ইসলাম— এই দুই ধর্মেই নারীর পোশাক পরিচ্ছদ নিয়ে কঠোর নিয়ম রয়েছে। করিন্থীয়ানে বলা হয়েছে যে, স্ত্রীলোক যদি তার মাথা না ঢাকে তবে তার চুল কেটে ফেলাই উচিত, কিন্তু চুল কেটে ফেলা বা মাথা নেড়া করা যদি স্ত্রীলোকের পক্ষে লজ্জার বিষয় হয়, তবে সে তার মাথা ঢেকে রাখুক। আবার পুরুষ মানুষের মাথা ঢেকে রাখা উচিত নয়, কারণ সে ঈশ্বরের স্বরূপ ও মহিমা প্রতিফলন করে। কিন্তু স্ত্রীলোক হলো পুরুষের মহিমা। স্ত্রীলোকের জন্য পুরুষের সৃষ্টি হয়নি, কিন্তু পুরুষের জন্য স্ত্রীলোকের সৃষ্টি হয়েছিল। এই কারণে এবং স্বর্গদূতদের জন্য অধীনতার চিহ্ন হিসাবে একজন স্ত্রীলোক তার মাথা ঢেকে রাখবে। আরো বলা হয়েছে যে, স্ত্রীলোক কখনোই পুরুষদের পোশাক পরবে না এবং পুরুষ কখনোই স্ত্রীলোকের পোশাক পরবে না। যে এই কাজ করে সে নাকি ঈশ্বরের কাছে ঘৃণার পাত্র! ঈশ্বর আদৌ কাউকে ঘৃণা করেন কি না সেই দ্বন্দ্বে না গিয়েও এটুকু বলতে পারা যায় তথাকথিত পাশ্চাত্য সভ্যতা ও খৃষ্টধর্মের গুণগ্রাহীদের যে, এই বাধানিষেধ কিন্তু সেই হিন্দু ধর্মে ছিল না। নারীর পুরুষোচিত পোশাক পরিধান করার উল্লেখ মহাভারতে রয়েছে। আবার ইসলামের হানাফি, শফী, মালিকি ও হানবলি প্রভৃতি সুন্নী গোষ্ঠীগুলি বিধান দেয় যে, জনসমক্ষে একজন নারীকে তার মুখমণ্ডল ও হাত বাদ দিয়ে বাকি সমগ্র দেহ আচ্ছাদিত রাখতে হবে। নারীদের শালীন পোশাক হিসাবে জিলবাব, খিমার বা হিজাব ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। কোরানেও নারীকে আত্মীয় ব্যতীত অন্য পুরুষের সম্মুখে এই ধরনের পোশাক পরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শালীনতাবোধ বিষয়টি প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত। সেখানে ধর্মের এই হস্তক্ষেপ কেন?

হিন্দুদের বিখ্যাত আচার সংহিতা মনুস্মৃতিতে বলা হয়েছে যে, পুত্র ও কন্যাসন্তান হলো সমান। এক কন্যার উপস্থিতিতে কেউ সম্পত্তি থেকে তার অধিকার ছিনিয়ে নিতে পারে না। একজন অবিবাহিতা কন্যারই একমাত্র তার মায়ের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পূর্ণ অধিকার আছে। কিন্তু কোরানের আন্ নিসা নামক সূরায় বলা হয়েছে যে, একজন পুরুষের অংশ দু'জন নারীর অংশের সমান। বাইবেলে রয়েছে যে, জেলোফেহাদের পুত্র না থাকায় তার চার কন্যার মধ্যে ভূসম্পত্তি বণ্টন করা হয়। কিন্তু কোনো ব্যক্তির যদি পুত্র ও কন্যা দুইই থাকে তবে তার সম্পত্তিতে কার কী উত্তরাধিকার থাকবে সেই বিষয় সম্পর্কে বিশেষ কোনো তথ্য নেই।

মনুস্মৃতিতে বলা হয়েছে যে, নারীকে তার পিতা, ভ্রাতা, স্বামী এবং ভ্রাতৃস্থানীয়রা অবশ্যই সম্মান দেবে যদি তারা নিজেদের কল্যাণ কামনা করে। যে পরিবারে কোনো নারী পুরুষদের আচরণের জন্য দুঃখ ভোগ করে, সেই পরিবারের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যে পরিবারে নারীরা সর্বদা সুখে থাকে সেই পরিবারে চিরকাল সমৃদ্ধি দেখা যায়। কোনো পরিবারে নারী যদি অপমানিত বা অত্যাচারিত হয় এবং পুরুষদের প্রতি অভিশাপ দেয় তবে বিষ পান করলে যেমন মৃত্যু ঘটে ঠিক তেমন ভাবেই ওই পুরুষদের উপর বিনাশ নেমে আসবে। অতএব, হিন্দুধর্ম মনে করে যে সুখী স্ত্রী হলো সুখী সংসারের চাবিকাঠি। পক্ষান্তরে কোরানের আন্ নিসা সূরায় বলা হয়েছে যে, পুরুষেরা নারীদের ওপর কর্তৃত্বশীল এজন্য যে তারা অর্থ ব্যয় করে। সেখানে ৩৪ সংখ্যক আয়াতে অবাধ্য স্ত্রীলোকদের প্রতি প্রহার করার 'সদুপদেশ'ও প্রদান করা হয়েছে। হিন্দু ধর্মগ্রন্থে কিন্তু কোথাও স্ত্রীর উপর এই শারীরিক অত্যাচার করার কথা বলা হয়নি। বাইবেলে এই প্রসঙ্গে তেমন তথ্য নেই।

নারীদের উপর যারা অত্যাচার করে মনুস্মৃতিতে তাদের প্রতি কঠোর দণ্ড প্রদান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই গ্রন্থের ৮ম অধ্যায়ে নারীহরণকারীর অঙ্গচ্ছেদ বা মৃত্যুদণ্ডের বিধান দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি নারীর সম্মান হরণকারীর অঙ্গচ্ছেদ ও আর্থিক জরিমানার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। সীতার অপহরণকারী রাবণ এবং দ্রৌপদীর অবমাননাকারী কৌরবকুলের কী পরিণতি হয়েছিল আপামর জনসাধারণের তা বিদিত আছে। এই ধরনের অন্যায়কে নিন্দা করা হলেও কী শাস্তি দেওয়া হবে সে প্রসঙ্গে কোরানে সরাসরি কোনো নির্দেশ নেই। তবে ইসলামে বলা হয়েছে যে, অভিযোগকারিণীকে তার অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য চারজন পুরুষকে সাক্ষী হিসাবে পেশ করতে হবে। প্রশ্ন হলো, কোনো পুরুষ কি চারজন পুরুষের সামনে কোনো নারীকে অপহরণ বা তার সম্মানহানি করার ধৃষ্টতা দেখাতে পারে? অথবা কোনো অত্যাচারিতা নারীর পক্ষে কি এই প্রেক্ষিতে চারজন পুরুষকে সাক্ষী হিসাবে জোগাড় করা সম্ভব? বাইবেলের ডিউটেরোনমি অংশে আবার বলা হয়েছে যে, কোনো মানুষ অপরের বাগদত্তা কোনো কুমারীর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হলে তাদের দুজনকেই নগরের দ্বারে সকলের সামনে নিয়ে গিয়ে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করার বিধান দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে মেয়েটির অপরাধ হলো এই যে, নগরের মধ্যে থেকেও সে কেন সাহায্যের জন্য চিৎকার করেনি। সব পরিস্থিতিতে কী একটি মেয়ের পক্ষে চিৎকার করা সম্ভব হয়? ওই অধ্যায়েই আবার বলা হয়েছে যে, অন্যের বাগদত্তা নয় এমন কুমারীর সম্মানহানি করা হলে সেই কন্যার পিতাকে ২০ আউন্স রুপা দিতে হবে ও সেই কন্যাকে বিবাহ করতে হবে এবং তার সঙ্গে সারা জীবন বসবাস করতে হবে! প্রশ্ন হলো, কোনো মেয়ে কি স্বেচ্ছায় তার সম্মান হরণকারীর সঙ্গে ঘর করতে চাইবে? কয়েক বছর আগে মরক্কোয় এই ধরনের একটি ঘটনার কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। বিবাহের পরে স্বামীর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে মেয়েটি বিষ পান করে আত্মহত্যা করেছিল। তার ক্ষেত্রেও সমাজের মান্যগণ্যরা সম্মানহরণকারীর সঙ্গেই মেয়েটিকে বলপূর্বক বিবাহ করতে বাধ্য করেছিল।

মনুস্মৃতির ৯ম অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, স্বামী ও স্ত্রী যেন সারা জীবন পরস্পরের সঙ্গে অতিবাহিত করে। কোন পরিপ্রেক্ষিতে একজন পুরুষ একাধিক বিবাহ করতে পারে এই অধ্যায়ের বিভিন্ন শ্লোকে সে সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। যেমন— বন্ধ্যা, কলহপ্রিয়া, দুর্ব্যবহারকারিণী, দুষ্ট প্রকৃতির নারী প্রভৃতি। আবার স্ত্রী অসুস্থা বা রুগ্না হলেও সে যদি সাধ্বী ও দয়ালু হয়, তবে ওই দ্বিতীয় বিবাহের পূর্বে স্বামীকে তার থেকে অনুমতি নিতে হবে। বাইবেলে সরাসরি কোনো বিধান না থাকলেও কোনো পুরুষের যে একাধিক স্ত্রী থাকতে পারে তা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। কোরানের আন্ নিসা সূরার তৃতীয় আয়াতে মুসলমানদের নিজের ইচ্ছামতো এক, দুই, তিন বা চার স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া যাদের ওপর কোনো পুরুষের 'দক্ষিণ হস্তের অধিকার আছে' সেই সব নারীদের সঙ্গেও তার সম্পর্ক স্থাপনের অধিকার আছে।

বাইবেলে বলা হয়েছে যে, কোনো পুরুষ বা নারী বেশ্যাবৃত্তির দ্বারা উপার্জিত অর্থ যেন ঈশ্বরের গৃহে না আনে অথবা সেই অর্থ দিয়ে কেউ যেন ঈশ্বরের কাছে করা মানত পূর্ণ না করে। কারণ এরা হলো পাপী এবং ঈশ্বর এদের ঘৃণা করেন। যে সকল সন্তানের মাতা-পিতার মধ্যে বৈধ বিবাহ হয়নি তাদের এবং তাদের পরবর্তী দশটি প্রজন্মকে উপাসনালয়ে যোগ দেবার অনুপযুক্ত মনে করা হয়েছে। অধ্যাপিকা আইশা মহম্মদ নাসরুদ্দিনের একটি অভিভাষণ থেকে জানা যায় যে ইসলাম ধর্মে গণিকাবৃত্তি নিষিদ্ধ। কোনো মেয়ে স্বেচ্ছায় অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে গণিকাবৃত্তি গ্রহণ করে বলে আমার জানা নেই। অনেক সময় অনাথ সহায়সম্বলহীন অশিক্ষিতা নারী, পাচারের শিকার হওয়া কিশোরী, স্বামী ও সংসার পরিত্যক্তা স্ত্রী এই ধরনের বৃত্তি অবলম্বন করে থাকে। তাকে যদি আমরা ঘৃণার চোখে দেখি সেটা কি অমানবিক আচরণ নয়? হিন্দুশাস্ত্রে কিন্তু জাবাল সত্যকামের উল্লেখও রয়েছে যার জননী একটি তথাকথিত হীন বৃত্তি অবলম্বন করেছিলেন। জগজ্জননী দেবী দুর্গার প্রতিমা গড়তেও কিন্তু হিন্দুরা গণিকাগৃহের মাটি গ্রহণ করে। নারীর অধিকার নিয়ে ইদানীং বহু মানুষ সরব হয়েছেন। এদের মধ্যে সমাজকর্মী, সাংবাদিক থেকে শুরু করে কলেজ অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাও রয়েছেন। তাদের অনেকেই আবার ভারতীয় বিশেষত হিন্দু চিরাচরিত ঐতিহ্যকে নানা প্রসঙ্গে তুলোধুনো করেন। তাঁরা যদি দয়া করে হিন্দুধর্মকে গালাগালি করার পূর্বে হিন্দু ধর্মশাস্ত্র ও তার পাশাপাশি খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্মশাস্ত্রগুলি পাঠ করেন তবে সবারই মঙ্গল। হিন্দু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও নারীজাতির প্রতি তাদের ঔদার্যপূর্ণ ব্যবহার থেকে বিশ্বের প্রতিটি জাতি ও ধর্মেরই শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। ■

গল্ফের বিস্ময়বালক শুভম

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আর পাঁচটা খেলার মতো গল্ফও একটি খেলা। কিন্তু ভারতে তার কদর খুব একটা নেই বললেই চলে। গল্ফের প্রতি ভারতীয় ছেলে-মেয়েদের আকর্ষণ খুবই কম। ভাবতেই পারে না ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, টেনিসের পাশাপাশি গল্ফও একটি আন্তর্জাতিক মানের খেলা। এই খেলাতেও বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতা হয়। যেখান থেকে আগামী দিনের গল্ফ-সম্রাট টাইগার উডসের মতো খেলোয়াড় এ দেশ থেকেও উঠে আসতে পারে। একথা আগাম ভেবেই গল্ফ খেলোয়াড় হওয়ার স্বপ্ন দেখে বছর আটেকের শুভম জাগলান। সম্প্রতি বিশ্ব গল্ফ চ্যাম্পিয়নশিপ (জুনিয়র) প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করেছে সে।

হরিয়ানার পাণিপথের ইসরানা গ্রামের বাসিন্দা শুভম্ জাগলান। এক দরিদ্র পরিবারে বেড়ে ওঠা তার। ছোট থেকেই গল্ফের প্রতি তাঁর আর্কষণ। কিন্তু সামর্থ্য হয়নি এই খেলাকে সঙ্গী করে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার। তাসত্ত্বেও শুভমের বাবা গল্ফ ট্রেনিং সেন্টারে ভর্তি করে তাকে। জাগালান পরিবারের পারিবারিক দুধের ব্যবসা। ছেলের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে এই ব্যবসাও তুলে দেন তিনি। অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে শুভম্ যখন খেলছে তখন গল্ফ অ্যাকাডেমির পক্ষ থেকে তাকে দিল্লী পাঠানোর বন্দোবস্ত করা হয়। গ্রামের অতিসাধারণ পরিবারের ছেলের এই অল্প বয়সে দিল্লির মতো শহরে একা কাটানো সম্ভব নয়। একথা আঁচ করে তার বাবা জগপাল জাগলান গোরু-মহিষ বিক্রি করে তাকে নিয়ে দিল্লি পাড়ি দেন। কিন্তু ছেলের স্বপ্নকে জলাঞ্জলি দিয়ে নিজের ব্যবসা বাঁচিয়ে রাখতে চাননি তিনি। বরং উলটোটাই করেছেন।

দিল্লী গল্ফ ক্লাবে শুরু হয় শুভমের প্রশিক্ষণ। পাশাপাশি দিল্লীর লক্ষণ পাবলিক স্কুলে চলতে থাকে তার পড়াশোনা। এক্ষেত্রে শুভমের যাবতীয় খরচ বহন করে গল্ফ ফাউন্ডেশন এবং দিল্লী গল্ফ ক্লাব। খেলার যাবতীয় সরঞ্জাম, টুর্নামেন্টে তাকে পাঠানো এবং লেখাপড়ার খরচ সবকিছুই। এমনকী ইউএসএ পাঠানোর খরচ পর্যন্ত স্পনসর করেছিল গল্ফ ক্লাব। সবচেয়ে সাড়াজাগানো হলো, সম্প্রতি ক্যালিফোর্নিয়ার সান দিয়েগোতে যে বিশ্ব গল্ফ চ্যাম্পিয়নশিপ (জুনিয়র) প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে অংশ নিয়ে শুভম জয়লাভ করে এবং বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের তকমাও জোটে তার কপালে। স্বভাবতই এই খবরে এক আনন্দঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে জাগলান পরিবারে। কারণ যে খেলাকে নিয়ে মানুষকে উৎসাহিতই হতে দেখা যায় না সেখানে শুভম বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন! এ প্রসঙ্গে শুভম বলে, 'আমি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এই টুর্নামেন্ট খেলে জয়লাভ করেছি, তাই খুবই আনন্দিত আমি।' সে আরও বলে, 'এক্ষেত্রে পুরো কৃতিত্ব দিতে চাই আমার পরিবার ও দিল্লী গল্ফ ক্লাবকে যারা এই টুর্নামেন্ট খেলতে এবং অনুশীলনের সুযোগ করে দিয়েছেন। গল্ফ ফাউন্ডেশনকেও ধন্যবাদ জানাই, কারণ আমি যা যা চেয়েছি তারা তা সমস্ত কিছু দিয়ে আমায় সাহায্য করেছিল বলেই আজ আমি এখানে।' পাশাপাশি শুভম তার কোচকেও ধন্যবাদ জানাতে ভুল করেনি। তার বক্তব্য, 'আমার এই জয়ের মূল কারিগর কোচ ননিতা লাল কুরেশি। তিনি আমাকে এই খেলায় উৎসাহ জুগিয়ে গেছেন ক্রমশ এবং সমস্ত প্রতিযোগিতা জিততে যে মনের জোর লাগে তাও তিনি দিয়ে গেছেন।'

গতবছরও শুভম এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। কিন্তু সে বছর জিততে পারেনি। যে ভুলের জন্য সেবার বেরিয়ে যেতে হয়েছিল প্রতিযোগিতা থেকে এবার আর তা হয়নি। অস্ট্রেলিয়ার জেফরি-ইউ-গুয়ানকে শেষ স্ট্রোকে হারিয়ে দেয় শুভম। শুধু এটা নয়, আমেরিকার আরও দু'টি ইভেন্টে সে রানার্স আপ হয়। শুভমের স্বপ্নের গল্ফ তারকা টাইগার উডস এবং জ্যাক নিকোলাস। এঁদের মতো সেও খেলতে চায়। তাই আজ বলা যেতে পারে শুভমকে দেখে অনেক ছেলেমেয়েই গল্ফ খেলায় উৎসাহিত হবে।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

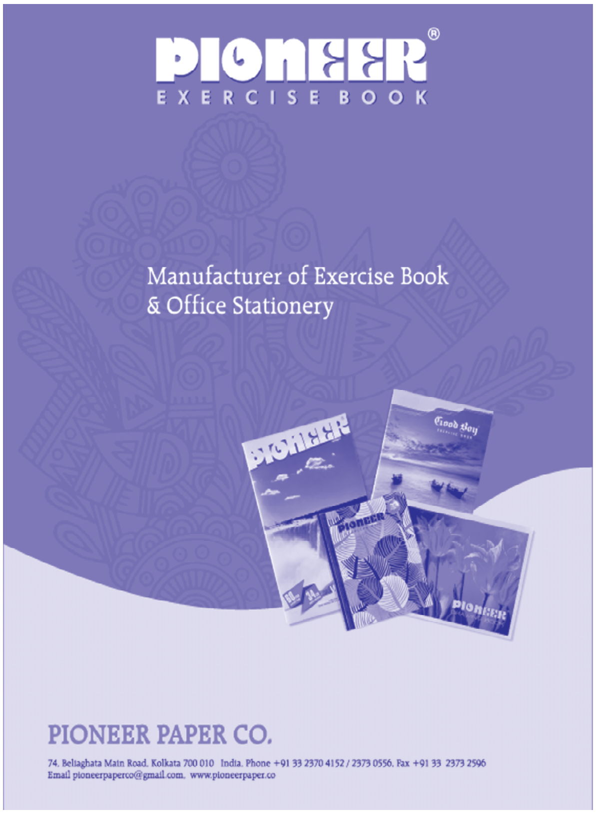

‘নারীর আদর্শ হিসাবে শত শত বৎসর ধরে সীতা, সাবিত্রী, রাণী অহল্যাবাঈ প্রভৃতির অনুসরণের পর আমরা কি এখন ভ্রষ্টচরিত্রা এবং বিবাহবিচ্ছেদকারিণী রূপে পরিগণিত হব? ভারতীয় নারী কি পদ্মিনীর পরিবর্তে গ্রীসের হেলেনের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে?’

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

সাংবাদিকতার অগ্রদূত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

ড. তিলক রঞ্জন বেরা

'পাতাবাহার' সাময়িক পত্রিকার এবছরের চৈত্র সংখ্যাটি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মরণে নিবেদিত। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জন্মসার্ধশতবর্ষে এই সুন্দর সংখ্যাটি উপহার দেওয়ার জন্য সম্পাদক প্রবীর সেনের ধন্যবাদ অবশ্যই প্রাপ্য। এই সংখ্যাটিতে প্রাসঙ্গিকী রেখেছেন অনুজ প্রতীম শ্রীমান অর্ণব নাগ যা সার্বিকভাবে ধন্যবাদের যোগ্য। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের দেড়শত জন্মবার্ষিকীতে বিদ্বান ব্যক্তিদের স্মরণ ও মনন আমাকে যথেষ্ট আপ্লুত করেছে। পত্রিকাটিতে 'পুরাতনী' পর্বে তাঁর অনুরাগী সাহিত্যিক, সাংবাদিক, চিত্রকর যাঁরা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সান্নিধ্যে এসেছেন, মেলামেশা করেছেন, তাঁরা তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে শ্রদ্ধা ব্যক্ত করেছেন। আমার মতো সাধারণ পাঠকেরও এই সমস্ত লেখা পড়ে তাঁর সম্পর্কে যথেষ্ট শ্রদ্ধা জাগ্রত হয়েছে। ছাত্রজীবনে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের শুধু নাম শুনেছিলাম, জীবনী জানার বিশেষ সৌভাগ্য হয়নি। এই স্মরণ সংখ্যাটি পড়ে অনেকটাই জানা গেছে--- তিনি কত বড় মাপের অধ্যাপক, সাংবাদিক তথা দেশহিতৈষী ছিলেন। সেকালে এম-এ পাশ করে কলেজে অধ্যাপনা শুরু তাঁর এবং স্বেচ্ছায় তা ত্যাগ করে পত্রিকা সম্পাদনার কাজকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করা এবং তাকেই জীবিকা হিসাবে নেওয়া—এটা বোধ হয় তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল। 'দাসী' ও 'প্রদীপ' পত্রিকার সম্পাদনার কাজ দিয়ে জীবন শুরু করলেও 'প্রবাসী' ও 'Modern Review' পত্রিকা দুটিই যেন তাঁরই প্রাণের দোসর। আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ক্ষিতিমোহন সেন, সুবোধ চন্দ্র

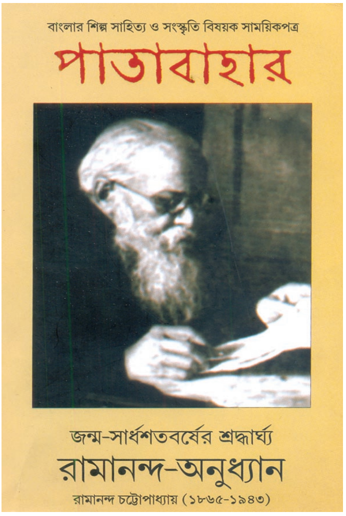

রায় প্রমুখ বিশিষ্ট সাহিত্যিক একবাক্যে স্বীকার করেছেন--- কীভাবে 'প্রবাসী' সম্পাদনার মধ্য দিয়ে সমাজকে শিক্ষিত করা যায়। বিশিষ্ট চিত্রকর নন্দলাল বসু, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর নতমস্তকে স্বীকার করেছেন— কীভাবে তাঁরা 'প্রবাসী'তে ছবি আঁকার মধ্য দিয়ে উৎসাহিত হয়েছেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়িতে আর্থিক স্বচ্ছলতা না থাকলেও দারিদ্র্য ছিল না। বাড়িতে অনেক জ্ঞানী-গুণী লোকের আনাগোনা ছিল এবং সর্বদা দেশ, সমাজ সম্পর্কে আলোচনা হোত। তাই কন্যাদের মধ্যে পিতার প্রতি ভক্তি তথা সাহিত্যরস যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। তাই তাঁর দুই কন্যা— শান্তাদেবী ও সীতাদেবীর পিতৃস্মরণ খুবই মনোমুগ্ধকর।

এও জানা যায় যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই সময় সম্পাদক রামানন্দের সাহস, ক্ষমতা, নানা বিষয়ে প্রভূত জ্ঞান ও সুরুচির পরিচয় পেয়ে 'প্রবাসী'র আবির্ভাবকে অভিনন্দিত করেছিলেন। সৎ সাংবাদিকতার আদর্শ থেকে তিনি কোনোদিন বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হননি— তাঁর জীবন থেকে ভবিষ্যৎ সাংবাদিকদের গ্রহণীয় সবচেয়ে বড় শিক্ষা বিশিষ্টজনেরা একবাক্যে স্বীকার করেছেন— প্রতি মাসের 'প্রবাসী'র জন্য তাঁরা ছাত্রাবস্থায় কীভাবে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেন। 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' দেশের বিভিন্ন কলেজের লাইব্রেরিতে যথেষ্ট সমাদৃত হোত। রামানন্দবাবুর অসাধারণ কৃতিত্ব এই যে, সমস্ত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও বাংলা ও ইংরাজি দুইখানি মাসিক পত্রিকার মধ্য দিয়ে দেশের জনমত গঠনে সাহায্য করেছেন। 'শতরূপে সারদা' গ্রন্থে স্বনামধন্য লেখকগণ/শ্রদ্ধেয় সন্ন্যাসীগণ মা সারদাকে যেমন বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। সেইরূপ এই পত্রিকার সংখ্যাটিও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বিশ্বরূপ দর্শনের পরিচায়ক। এই বিষয়ে পাঠককে সহযোগিতা করেছেন শ্রীমান অর্ণব নাগ, তাঁর বিশ্লেষণমূলক লেখা দিয়ে 'প্রাসঙ্গিকী' পরিচ্ছেদে। বাগানের বিভিন্ন ফুল দিয়ে মালা গাঁথলে যেমন আলাদা সৌন্দর্য, মাধুর্য অনুভূত হয়, তেমনি তিনি সমস্ত লেখকের রস ও গন্ধ নিয়ে একটা নির্যাস পরিবেশন করেছেন, যা থেকে পুরো বিষয়ের আস্বাদ পাওয়া যায়। পাঠকরা নিঃসন্দেহে প্র্যত্যেকটি লেখা পড়ে নিজের মতো রস আস্বাদন করতে পারবেন যার স্বাদ ও আনন্দ অনাবিল।

পাতাবাহার ত্রৈমাসিক, চৈত্র, ২০১৫। বিষয় : রামানন্দ-অনুধ্যান, সম্পাদক : প্রবীর সেন। মূল্য : ১৫০ টাকা।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

হাওড়ার তাজপুরে ড. শ্যামাপ্রসাদের জন্মজয়ন্তী

গত ৬ জুলাই শ্যামাপ্রসাদ ইনস্টিটিউট অব্ কালচার, তাজপুর, হাওড়া-র উদ্যোগে সারাদিন ব্যাপী নানাবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১১৫তম জন্মজয়ন্তী পালিত হয়েছে। সকালে 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত ও পরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, বিবেকানন্দ, শ্যামাপ্রসাদ ও প্রসাদবাবুর মর্মর মূর্তিতে মাল্যার্পণ করা হয়। ইনস্টিটিউটের সভাগৃহে এক সমাবেশে ড. মুখোপাধ্যায়ের জীবনী আলোচনা করা হয়। এরপর বর্ষব্যাপী বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। দীর্ঘ ৩১ বৎসর ধরে এই দিনটি স্বেচ্ছা রক্তদান দিবস হিসাবে পালিত হয়ে আসছে। আয়োজিত এই ৩৩ তম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমে ৭৩ জন পুরুষ ও ১২ জন মহিলা-সহ মোট ৮৫ জন রক্তদান করেন।

বিকালে সরস্বতী শিশু মন্দিরের বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের মিলিত উদ্যোগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ড. শ্যামাপ্রসাদের জীবনী আলোচনা, নৃত্য, গীত, আবৃত্তি ও কবিতা পাঠ পরিবেশিত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সৈয়দ মনিরুজ্জামান।

হলদিয়ায় বি এম এসের রক্তদান শিবির

ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে গত ২৩ জুলাই হলদিয়ার বি এম এস কার্যালয়ে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। রাজ্য সম্পাদক শঙ্কর দাস, রাজ্য সহ-সভাপতি কনক পাণিগ্রাহী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সমাবেশ সমাচার

আসানসোল সমাজ সেবা ভারতীর উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ

গত ১৫ থেকে ২৯ জুলাই অরণ্য সপ্তাহ উপলক্ষে সমাজ সেবা ভারতীর (পশ্চিমবঙ্গ)-র নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে আসানসোল জেলার দুর্গাপুর, ইছাপুর, পানাগড়, রাণীগঞ্জ, জামুরিয়া, বারাবলি প্রভৃতি অঞ্চলে বৃক্ষরোপণ করা হয়। বিভিন্ন সেবা প্রকল্পের শিক্ষার্থীরা দাদাভাই/দিদিভাইদের সঙ্গে প্রায় ১৭৫টি বৃক্ষরোপণ করে। সর্বত্র স্থানীয় মানুষজনের অকুণ্ঠ সহযোগিতা করেছেন। সঙ্ঘের প্রান্ত সেবা প্রমুখ মনোজ চট্টোপাধ্যায় এবং সমাজসেবা ভারতীর আসানসোল জেলা কার্যকর্তা অরিজিৎ চট্টোপাধ্যায় বিভিন্ন স্থানে উপস্থিত থেকে উৎসাহ প্রদান করেন। মনোজ চট্টোপাধ্যায় বলেন, শুধু গাছ লাগানোতেই কার্যক্রমের শেষ নয়। গাছের পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে এবং আগামী বছর এই সময় পর্যন্ত যাদের লাগানো গাছ সুস্থ ও সতেজ থাকবে তাদের পুরস্কৃত করা হবে। একই সঙ্গে সেবা প্রকল্পগুলির মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় সাড়ে তিনশত পরিবারে প্লাস্টিক বর্জন ও পানীয় জল শোধনের বিষয়ে প্রচার করা হয়।

মঙ্গলনিধি

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কাঁথি জেলার এগরা নগর কার্যবাহ শক্তিপদ শীঠ তাঁর শুভ বিবাহের প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে গত ২৩ জুলাই মঙ্গলনিধি প্রদান করেন কাঁথি জেলা প্রচারক স্বপন কুমার প্রামানিকের হাতে। অনুষ্ঠানে দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত ঘোষ প্রমুখ গৌরাঙ্গ খাঁড়া ও অন্যান্য স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

দিনহাটায় কুটুম্ব প্রবোধনের সভা

গত ১২ জুলাই দিনহাটা মদনমোহন পাড়া সারদা শিশুতীর্থে কুটুম্ব প্রবোধনের কার্যক্রম হয়। কার্যক্রমে শহরের ১৩টি পরিবারের মোট ৩৪ জন উপস্থিত ছিলেন। কার্যক্রমে পৌরোহিত্য করেন নজিরহাট হরকুমারী উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষিকা সুপ্রভা ঘোষ। তিনি কার্যক্রমের শুরুতে দীপ প্রজ্বলন করেন। দিনহাটা মহকুমা এবং নগর সঙ্ঘচালক অখিল সরকার। সরস্বতী ও ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন কল্যাণ পাল। উত্তরবঙ্গ প্রান্ত কুটুম্ব প্রবোধন প্রমুখ মটুকেশ্বর পাল আদর্শ পরিবার গঠনের বিষয়ে আলোচনা করেন। সুপ্রভা ঘোষ স্বচ্ছ এবং আদর্শ পরিবার তৈরি হলে তবে আদর্শ সমাজ গঠন হবে বলে উল্লেখ করেন। শান্তিমন্ত্র পাঠের মধ্য দিয়ে কার্যক্রম সমাপ্ত হয়।

যাদবপুরে শ্যামাপ্রসাদ স্মারক সমিতির উদ্যোগে শ্যামাপ্রসাদ স্মরণসভা

যাদবপুর শ্যামাপ্রসাদ স্মারক সমিতির উদ্যোগে গত ১১ জুলাই সন্ধ্যায় যাদবপুর স্থিত বাঘাযতীন পাবলিক হলে পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টা, হিন্দু বাঙালির রক্ষাকর্তা ভারতকেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর স্মরণসভা পালন করা হয়। এই সভায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রাক্তন প্রচারক তথা পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি-র প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকুমার ব্যানার্জীকে শ্যামাপ্রসাদ স্মারক সম্মান প্রদান করা হয়। সুকুমার ব্যানার্জী তাঁর প্রচারক জীবন, শ্যামাপ্রসাদের সান্নিধ্য এবং পরবর্তীকালের বিজেপি-তে আসা নিয়ে স্মৃতিচারণ করেন। এই সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অধ্যাপক ড. স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ।

পরলোকে প্রবীণ প্রচারক নারায়ণ চন্দ্র পাল

লোকান্তরিত হলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক নারায়ণ চন্দ্র পাল। কয়েকদিন অসুস্থ থাকার পর গত ২৩ জুলাই সকাল ৮-৩০ মিনিটে কলকাতার সি এম আর আই হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। উত্তর ২৪ পরগনার হাসনাবাদের বরুণহাট গ্রামে তার পৈতৃক বাস ছিল। ১৯৭৪ সালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সংস্পর্শে আসেন। প্রথমবর্ষ সঙ্ঘশিক্ষা করার পর ১৯৭৫ সালে সঙ্ঘের প্রচারক হিসেবে নিজেকে সমর্পিত করেন। সঙ্ঘের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করার পর বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের প্রদেশের সংগঠন সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছিলেন।

সদাহাস্যময় নারায়ণদা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ থেকে পড়াশুনা করেন। সেখান থেকেই তিনি এমএ পাশ করেন। তাঁর মৃত্যু সংবাদ শোনার পর স্বামী যুক্তানন্দ মহারাজের উক্তি— 'নারায়ণ পাল দুই সঙ্ঘের মধ্যে সেতু হিসাবে কাজ করছিলেন'। হাসপাতাল থেকে তাঁর মরদেহ প্রথমে ৮৪ নং সঙ্ঘ কার্যালয় ও পরে কেশব ভবনে আনা হয়। কেশব ভবনে বহু স্বয়ংসেবক ও কার্যকর্তা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। নিমতলা শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

শোকসংবাদ

মালদা জেলার সদর মহকুমার কদমতলা শাখার স্বয়ংসেবক সজল রায়ের বাবা বৈদ্যনাথ রায় গত ২৩ জুলাই পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বছর। তিনি ২ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

অমলিন উত্তমকুমার

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

গত ২৪ জুলাই মহানায়ক উত্তমকুমারের ৩৫তম মৃত্যুদিন পালনের তোড়জোড় শুরু হয়েছে। নন্দনে তাঁর ১৫টি ছবি দেখানো হবে। নতুন জীবনীও নাকি বেরোচ্ছে। লক্ষণীয় জন্মদিন নয় বরাবরই উত্তমকুমারের মৃত্যুর দিনটিই চলচ্চিত্রপ্রেমী-অপ্রেমী নির্বিশেষে স্মরণ করেন। স্বভাবতই এর পেছনে ক্রিয়াশীল থাকে কোনো প্রিয়জনকে অকালে হারানোর বেদনাকে চিরস্থায়ী করার অভিলাষ। ২৫ বৈশাখ আর রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুদিন ২২ শ্রাবণের উচ্ছ্বাস ও বেদনার তুলনামূলক আলোচনা হলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। আসলে উত্তমকুমারের চরিত্রাভিনেতা হিসেবে তাঁর মৃত্যুর সময়টি ছিল এক উত্তরণের সন্ধিক্ষণ। অথচ আচমকাই থেমে গেল সেই প্রক্রিয়া।

এখানে মনে পড়ে প্রায় তাঁর জীবনালেখ্য 'নায়ক' ছবিতে তাঁর নাট্যগুরু শঙ্করদার সংলাপ : "তোর দুটো ছবি পর পর লেগে গেল— তুই তর তর করে ওপরে উঠে গেলি। তারপর তিন নম্বর মার খেলো, চার নম্বর মার খেলো, তুই দেখলি, যে সিঁড়িটা দিয়ে তুই ওপরে উঠেছিস সেটা কে যেন সরিয়ে নিয়ে গেছে। তুই সেই যে মুখ থুবড়ে পড়লি... একেবারে finished for all time।"

উত্তমকুমার তাঁর সমগ্র অভিনয় জীবনে এই আশঙ্কা সদাই সঙ্গোপনে বয়ে বেড়িয়েছেন। কিন্তু তিনি তাঁর নিত্য দিনের অভিনয়কলার সাধনায় এই অনিবার্য ব্যর্থতাকে কাটিয়ে বয়সভার জয় করে মাথা উঁচু করে ঘুরে দাঁড়াতে পেরেছিলেন। উত্তমকুমার কী ছিলেন, কেন তিনি মৃত্যুর এত দীর্ঘকাল পরেও স্মৃতিতে সজীব সে নিয়ে অসংখ্য মূল্যায়ন রয়েছে। নিত্য নতুন বিশেষণ প্রয়োগ নিষ্প্রোয়জন। কিন্তু তাঁর অভিনয়-যাত্রায় তিনি যে উপরিউক্ত ভবিষ্যদ্বাণীকে বেঠিক প্রমাণ করেছিলেন তা তাঁর চলচ্চিত্র পথের রেখাচিত্রই সাক্ষী দেয়। তিনি নয় নয় করে তিনবার নাম (অরুণকুমার, অরূপকুমার, উত্তমকুমার) বদল করেও সাতখানি সম্পূর্ণ ব্যর্থ ছায়াছবি মাথায় নিয়ে কর্মজীবন শুরু করার পর দুর্জয় সাহস দেখিয়ে পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছিলেন। জন্ম-রোমান্টিক মানুষটি তখনই বিবাহিত এবং ১৯৫০ সালেই একমাত্র পুত্রের পিতা কিন্তু তাঁর সিনেমার প্রতি গভীর মমত্ববোধ-জারিত সংলাপটি দেখুন : "আমাকে ঘিরে আলো ঝলমল করে উঠল। ক্যামেরা প্রস্তুত হলো। সেই দিনই আমার আশৈশব কালের স্বপ্ন যেন বাস্তবের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। সেই আমার প্রথম সিনেমায় অভিনয় করা। দৈনিক পাঁচ সিকে পারিশ্রমিক নিয়ে আমি সিনেমার অভিনেতা বনে গেলাম। ১৯৪৭-এর সেই 'মায়াডোর' ছবিটি মুক্তি পায়নি আজও অথচ সেই সময় আমি প্রতিদিনই রুপালি পর্দায় নিজেকে দেখব বলে প্রতীক্ষা করেছি।" প্রসঙ্গত, এই কথাগুলি তিনি বলেছিলেন তাঁর নিজের সই করা একমাত্র authorised biography 'আমার আমি'-তে। বইটি উত্তমবাবুর জীবিতাবস্থায় প্রথমে ১৯৭৩ সালে দে'জ পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত হয়। আত্মজীবনীটি অনুলিখন করেছিলেন তৎকালীন উত্তম-ঘনিষ্ঠ সাংবাদিক গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ। উত্তমকুমারের মৃত্যুর পর শুধু সেপ্টেম্বর ১৯৮০-তেই এই বইয়ের

সপ্তপদী ছবিতে উত্তম-সুচিত্রা।

তিনটি সংস্করণ (প্রতিটি ৫৫০০ করে) নিঃশেষিত হয়। অনুলেখক ১৯৮০'র সংস্করণটিতে বলেছেন : "দাদার মহাপ্রয়াণের পর নিছক ব্যবসার জন্য আমাকে যে কলম ধরতে হয়নি তার জন্য আমি কৃতার্থ"। কথাটি ঠিক। আজকাল একই বই আর পুরনো কিছু স্মৃতিচারণ ঢুকিয়ে খুব ব্যবসা হচ্ছে।

আগেই বলা ব্যর্থতা থেকে উত্থিত উত্তমকুমার ১৯৫২ সালে নির্মল দে-র (সত্যজিৎ এই পরিচালককে যথেষ্ট স্বীকৃতি দিয়েছেন) বসু পরিবার ও ১৯৫৩ সালে সাড়ে চুয়াত্তর থেকেই তাঁর যাত্রাপথ মসৃণ করতে থাকেন। ১৯৫৫ থেকে '৭৫ তাঁর নিজ-নির্মিত রাজপথ দিয়ে রাজপুরুষের পরিক্রমা ও অভিনয় পরাক্রমের টানটান কাহিনি। তবুও মোহনবাগন ক্লাবে ফুটবল খেলার মতো

চলচ্চিত্রীয় আভিজাত্য তিনি ছুঁলেন ১৯৬৬ ও '৬৭ সালে সত্যজিৎ-এর নায়ক ও চিড়িয়াখানা-র মাধ্যমে। নায়কেও কিন্তু তাঁর কোনো সরাসরি রোমান্টিক ভূমিকা নয়। অথচ সত্যজিৎ রায়ের ভাষায় একজন (বৈকালিক বিগ্রহের) matinee Idol-এর চূড়ান্ত রোমান্টিকতা তিনি পরতে পরতে উন্মোচন করেছেন। এটি দেখে প্রখ্যাত ব্রিটিশ চলচ্চিত্র সমালোচক Derek Malcom লিখেছিলেন--- ছবিটি বিদেশি অভিনেতাদেরও দেখা উচিত। অনেক পরে অনাবাসী ভারতীয়দের লস এঞ্জেলেসের এক অনুষ্ঠানের অতিথি হিসেবে তিনি সরাসরি বিদেশি অভিনেতাদের টালিগঞ্জের পিছিয়ে থাকা প্রযুক্তিতে কাজ করার চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন। কথাটি বলার কারণ উত্তম যখন এসেছিলেন সেই ১৯৪৭ সালের গোড়ায় তখনও নিউ থিয়েটার্স তুমুলভাবে সক্রিয়। আর জমিদার বংশীয় দিব্যকান্তি দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পুলিশি ছেড়ে সুদর্শন অভিনেতা ধীরাজ ভট্টাচার্যরা পর্দা জুড়ে রয়েছেন। এদের মধ্যে দিয়ে রাস্তা করতে নিউ থিয়েটার্স ঘরানার অভিনয়ের বাইরে তিনি প্রথম দেখালেন হলিউড স্টাইল (মনে পড়বে নায়ক ছবিতে পুরনো দিনের অভিনেতা বীরেশ্বর সেন উত্তমকে বলছেন এটা soliloquy না হলিউড স্টাইল)। অভিনয় পদ্ধতিতে বদল ঘটিয়ে সাইড থেকে ক্যামেরার দিকে তাকানো যা তরুণ মজুমদারের (যাত্রিক) চাওয়া পাওয়া, অজয় করের হারানো সুর, সপ্তপদী, অসিত সেনের জীবনতৃষ্ণার মতো বহু হিট ছবির ছিল একেবারে নতুন চমক। এর মূলে ছিল মেট্রো সিনেমায় দীর্ঘদিন ধরে হলিউডি ছবি দেখা ও সর্বাধুনিক অভিনয়-রীতির মানসিক অনুশীলনের অভ্যাস। অবশ্য বাবা সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় মেট্রোর চিফ অপারেটর হওয়ায় সুবিধেও হয়েছিল।

তিনি নিজেই স্বীকার করে গেছেন অস্কারজয়ী রোনাল্ড কোলম্যান (১৮৯১-১৯৫৮)-এর The Random Harvest এর অনুসরণেই তিনি 'হারানো সুর' ছবিটি নিজে প্রযোজনাও করেছিলেন। তাঁর জয় জয়ন্তী বা কোলম্যানের 'Prisoner of Zenda'-এর অনুপ্রেরণায় তপন সিংহের ঝিন্দের বন্দী ছবিতেও এই ছায়া পাওয়া যায়। তাহলে কি কেবল হলিউডি অনুকরণেই বাজিমাত করেছিলেন তিনি? না, বৃটিশ আমলে যেমন বহু বিখ্যাত বাঙালি ধুতির ওপর কোট গায়ে দিয়েও তাঁদের বাঙালিত্ব ষোলআনা বজায় রেখেছিলেন, ঠিক তেমনি উত্তম তাঁর স্বভাব-নৈপুণ্যে বাঙালি চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণের পর নিজের ঈশ্বরদত্ত লাবণ্য ও অভিনয় সৌকর্যে তা নিখুঁতভাবে প্রকাশ করেছিলেন।

১৯৪৭ থেকে '৫২ অবধি নিষ্ফলা বছরগুলির তীব্র বেদনা উত্তমকুমার সহ্য করেছিলেন। হজম করেছিলেন তাঁরই ভবানীপুর পাড়ার ছেলে তখন একটু নামকরা প্রদীপকুমারের অপমানজনক উপেক্ষা। ভাগ্যের পরিহাসে উত্তম প্রযোজিত গৃহদাহ ছবিতে স্যুট-বুট পরিহিত অবস্থায় চোখা চোখা সংলাপ থাকলেও ধুতি পাঞ্জাবির আভরণে পরিশীলিত চলচ্চিত্র অভিনয়ে মহিমের কাছে সুরেশরূপী প্রদীপকুমার ম্রিয়মান হয়ে যান। এই শৈল্পিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার জেদ ছিল উত্তমকুমারের নিজস্ব।

প্রায় দুটি যুগেরও বেশি সময় ধরে নায়ক থেকে নায়কোত্তম হয়ে ওঠার গৌরব কাহিনি আবার পশ্চাৎমুখিনতার মুখে পড়ে। ১৯৭৬ সালে (মহানায়কের বয়স ঠিক তখন ৫০) হোটেল স্নো ফক্স থেকে তাঁর মৃত্যুর ঠিক আগে ২৭জুন, ১৯৮০-তে মুক্তি পাওয়া দর্পচূর্ণ অবধি ২৭ খানি ছবির মধ্যে বাণিজ্যিক অর্থে মাত্র (আনন্দ আশ্রম-সহ) ১০টি ছবি হিট করেছিল। এই ২৭টির মধ্যে উত্তম ঘনিষ্ঠ পরিচালক 'সন্ন্যাসী রাজার' পীযূষ বসুরই ছিল ৬টি ছবি, প্রখ্যাত পরিচালকগোষ্ঠী যাত্রিক বা সলিল দত্তের মতো সফল পরিচালক কেউই বাদ ছিলেন না। তথাপি ছবিগুলি ভালো করে দেখলে বোঝা যাবে পরিচালকেরা সেই ভাবে চিত্রনাট্যে প্রৌঢ় উত্তমকুমারকে জমাট বা রাশভারী চরিত্র দিতে পারছিলেন না। অনেকেই বেঢপ পরচুলা পরাচ্ছিলেন যাতে বয়স কমে (ব্রজবুলি, রাজবংশ, ভোলা ময়রা ইত্যাদি) অথচ যেখানেই তিনি বয়সানুগ চরিত্র করার সুযোগ পেয়েছেন যেমন ধনরাজ তামাং বা বয়সোচিত দেবদাসের চুনীলাল, দুই পুরুষ বা বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশে সব্যসাচী ছবিকে তিনি অনায়াস দক্ষতায় টেনে নিয়ে গেছেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পরে মুক্তি পাওয়া বড়দাদার চরিত্র সম্বলিত দুই পৃথিবী সুপার হিট। শঙ্করদার বলা সেই finished for ever বা মুখ থোবড়ানোর অমোঘতা মিথ্যে করে দিয়েছেন। এখানেই তিনি অনন্য— তাঁর সম্পর্কে আন্তরিক বন্ধু ও বাঙলার শ্রেষ্ঠ সুন্দরী অভিনেত্রী সুচিত্রা সেনের মূল্যায়নটি অব্যর্থ— "উত্তমকে ঠিক মতো কেউ ব্যবহার করলে না।" বা উত্তমকুমারের মৃত্যুর পরেই টেকনিসিয়ান স্টুডিওতে সত্যজিৎ রায়ের চিরস্মরণীয় শ্রদ্ধাঞ্জলি।— "আজ উত্তম নেই, আমার মনের একটা বিশেষ অবস্থা যেটা এর আগে মাত্র দু'বার হয়েছে। একবার যখন তুলসী চক্রবর্তী চলে গেলেন। আর একবার যখন ছবি বিশ্বাস গেলেন। আজ এই সভাতে অনেক নায়ক উপস্থিত আছেন তাঁদের অনেকেই সুঅভিনেতা। অনেকের সঙ্গে আমি কাজ করেছি। কাজ করে আনন্দও পেয়েছি কিন্তু উত্তমের মতো কেউ নেই, উত্তমের মতো কেউ হবেও না।" ওই অনুষ্ঠানেই তিনি এও বলেছিলেন যে তাঁকে অধিকাংশ সময়েই দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্য কাজ করতে হয়েছে। অবশ্যই, গোটা ইন্ডাস্ট্রিটি নির্ভর ছিল তাঁর ওপরে। কিন্তু সত্যজিৎ তো মহীরুহ, তিনি এমন হৃদয় উৎসারিত ঘোষণা করলে কী হবে, তাঁর ছায়ায় থাকা কিছু পলিতকেশ বিশ্ববুদ্ধিজীবী বা পরিচালক (ইনিও সম্পূর্ণ কেশহীন) এখনও রয়ে গেছেন যাঁরা উত্তমকুমারের অভিনয়ের চুলচেরা উৎকর্ষ বিচার আজও সম্পন্ন করে উঠতে পারেননি। কিন্তু উত্তমবাবু তাঁর আপন ঔদার্যে এসব গ্রাহ্য করেননি।

অনেক সময়ই বিশেষ কোনো মানুষের মৃত্যু হলে বলা হয় একটি যুগের সমাপ্তি হলো। উত্তমযুগের সমাপ্তি কিন্তু এখনও পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না, তা প্রবহমান। তাঁর ডিভিডি'র বিক্রি আজও সবার আগে। টিভিতে ছবি হলে বিজ্ঞাপনের অভাব হয় না। তাঁর অভিনয়কলা ব্যবচ্ছেদকারীরা পারলে গবেষণা করতে পারেন। আমাদের মনে হয় আকাশের মতোই মানুষের মনেও উত্তম একটা মেঘমেদুর অঞ্চল তৈরি করেছেন, সেখানে ঢোকা দিলেই অজস্র সুখস্মৃতিভারে বৃষ্টিপাত হয়। উত্তম হয়ে ওঠেন চির-অমলিন।

শব্দরূপ-৭৫৭ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

	১	২	৩		৪		৫
		৫					
৬	৭		৮	৯			
১০		১১		১২		১৩	১৪
১৫			১৬		১৭		
		১৮		১৯		২০	
				২১	২২		
২৩							

সূত্র :

পাশাপাশি : **১.** 'মেঘনাদ বধ' রচয়িতা কবি, **৫.** বানান ভেদে নিকৃষ্ট, হীন, **৬.** তাসখেলায় এক খেপে নিক্ষিপ্ত তাস, **৮.** বধ, উচ্ছেদ, **১০.** অনর্থ, শুধু শুধু, **১২.** '---কুটুম্বকম্'; পৃথিবী সম্বন্ধীয়, **১৫.** কোলাহল, **১৭.** মাথাকাটা ভূতবিশেষ, **১৮.** মহামারী, **২০.** হিন্দি প্রতিশব্দে পর্যন্ত, **২১.** 'তুমি—নীরবে হৃদয়ে মম', **২৩.** কার্তিক-শুক্ল-একাদশী (বিষ্ণুর নিদ্রাভঙ্গ)।

উপর-নীচ : **২.** সন্ন্যাসীর অগ্নিকুণ্ড, **৩.** সংকেত; প্রস্তাবনা, **৪.** মিহি সুতী কাপড় বিশেষ, **৬.** শিবধনু, **৭.** পায়চারি, **৯.** মৃতদেহ, **১১.** হাত চেপে ধরে প্রীতিজ্ঞাপন, **১৩.** (সংগীতে) স্বরগ্রামের ষষ্ঠ স্বর, 'ধা' **১৪.** ঋণগ্রহণের জন্য কোনও বস্তু গচ্ছিত রাখা, **১৬.** '—যদি চাও ছোট হও তবে', **১৯.** শিলা, বর্ষোপল, **২২.** ভারতের প্রাচীনতম শাস্ত্র।

সমাধান
শব্দরূপ-৭৫৪
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
সুশীল কয়াল
কলকাতা-৬

		প্রা	য়ো	প	বে	শ	ন
অ	ন্ত্য	জ				ব	
ঙ্গ		ন	হু	ষ		সা	
রা	কা			ষ্ঠী		ধ	
	র		গা			না	গা
	ণ		ব	ড়	বা		ঞ্জী
	বা				র	বা	ব
অ	রি	ষ্ট	ল	ক্ষ	ণ		

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

৭৫৭ সংখ্যার সমাধান আগামী ২৪ আগস্ট ২০১৫ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

- ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।
- যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। 'চিঠিপত্র' **১৫০টি** শব্দের মধ্যে হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।
- ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।
- পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।
- গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।
- স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।
- লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
- রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
- লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

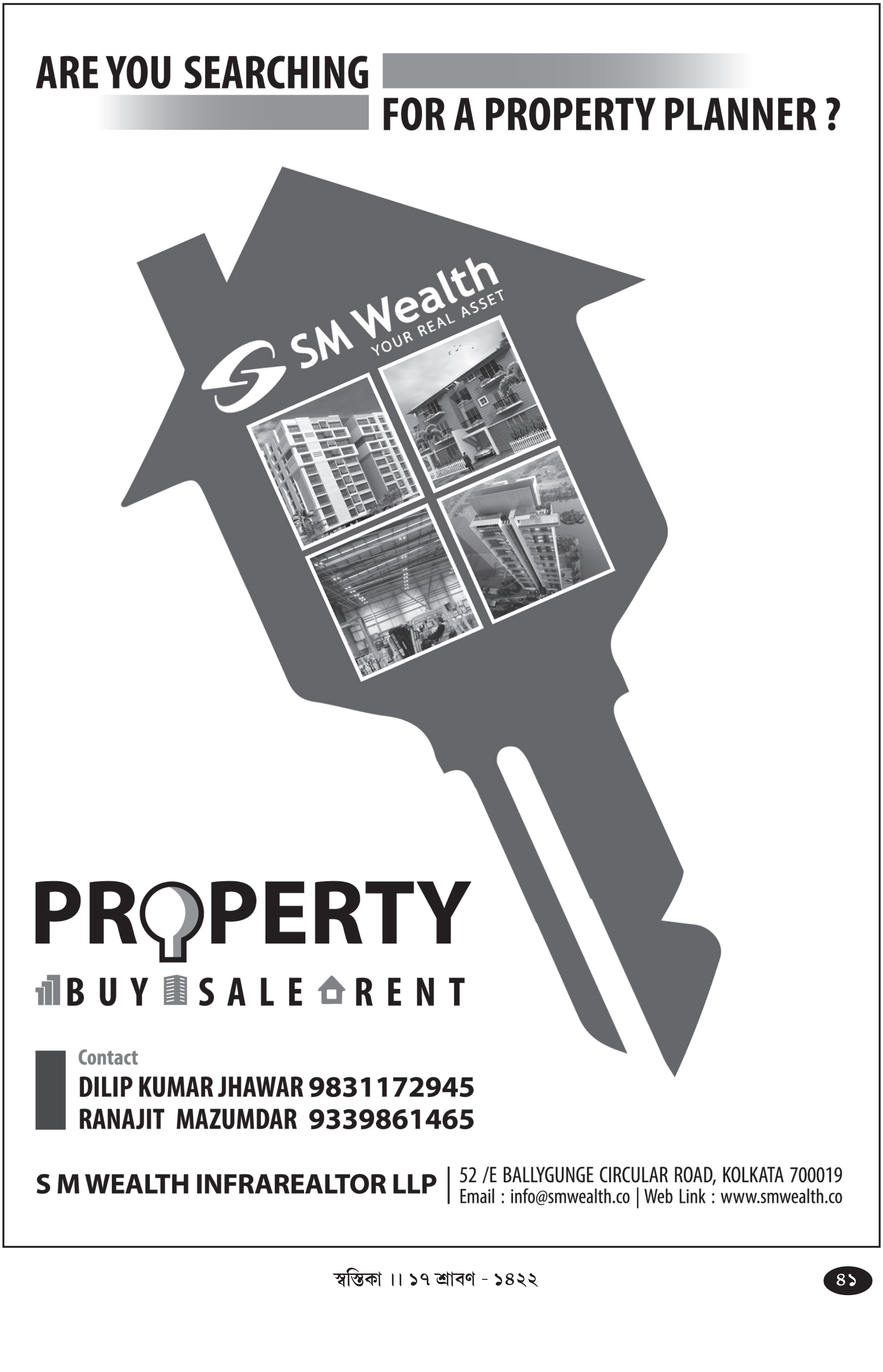
ARE YOU SEARCHING
FOR A PROPERTY PLANNER ?
SM Wealth
YOUR REAL ASSET
PROPERTY
BUY SALE RENT
Contact
DILIP KUMAR JHAWAR 9831172945
RANAJIT MAZUMDAR 9339861465
S M WEALTH INFRAREALTOR LLP
52 /E BALLYGUNGE CIRCULAR ROAD, KOLKATA 700019
Email : info@smwealth.co | Web Link : www.smwealth.co

বৃটেনের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের দাবি তুললেন শশী থারুর

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ সম্প্রতি বিশ্বখ্যাত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে সেখানে এক বিতর্কসভায় কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর দু'শ বছরের ইংরেজ শাসনে ভারত থেকে বাইরে চলে যাওয়া সম্পদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের প্রসঙ্গ তুললেন। প্রসঙ্গত আজ থেকে দশ বছর আগে ২০০৫ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ আইনের একটি সাম্মানিক ডক্টরেট উপাধি নিতে গিয়ে 'অক্সফোর্ড বক্তৃতায়' বলেছিলেন, 'এটা অনায়াসেই বলা যায় যে ভারত বৃটিশ সংস্পর্শে এসে প্রভূত উপকৃত হয়েছিল...। ভারতে আইনের শাসন, সংবিধান অনুসারী সরকার, মুক্ত সংবাদমাধ্যম প্রভৃতির ধারণা তখনকার বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রভাবেই পরিবর্তিত হয়েছিল। আমাদের দেশের বর্তমান প্রভাবশালী ও গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাগুলি প্রধানত তৎকালীন বৃটিশ মদতে গঠিত ইঙ্গ-ভারতীয় সংস্থাগুলিরই স্বাধীন রূপ যা দেশকে প্রভূত সাহায্য করেছে।'

শশী থারুর

অন্যদিকে থারুর তাঁর ভাষণে বলেন, ইংরেজ ভারত দখলের আগে বিশ্ব-বাণিজ্যে ভারতের ভাগ ছিল ২৩ শতাংশ। আর তাদের ভারত ছাড়ার সময় সেই পরিমাণ এসে দাঁড়ায় মাত্র ৪ শতাংশে। এর কারণ ব্যাখ্যা করে থারুর বলেন, ভারত শাসিত হয়েছিল একটিই লক্ষ্যে যাতে বৃটেন সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। দু'টি শতাব্দী ধরে বৃটেনের চোখ ধাঁধানো উত্থান সম্ভব হয়েছিল ভারতকে শোষণ করে।

বৃটিশ উপনিবেশবাদ শীর্ষক এক বিতর্কসভায় পনেরো মিনিটের চাঁচাছোলা বক্তব্যে থারুর দ্ব্যর্থহীন ভাষায় যুক্তি সাজিয়ে বলেন, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে বৃটেন সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল ভারতের সম্পদ তাদের দেশে পাচার করে। অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে থারুর জানান যে বৃটেনের শিল্পবিপ্লব সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল ছিল ভারতের উন্নত শিল্পগুলিকে ধ্বংস করে দেওয়ার ওপর। পরিণতিতে ভারত হয়ে পড়ে একটি রপ্তানিকারক থেকে ইংল্যান্ড নির্ভর আমদানিকারক দেশ। বিলিতি পণ্যে দেশ ছেড়ে যায়। বাড়তে থাকে বৃটিশ দ্রব্যের প্রতি মানুষের তীব্র আকর্ষণ।

বিস্ফোরক বক্তব্যে থারুর বিশ্লেষণ করে বলেন, 'বৃটিশের কলকাঠিতেই দেশে ১৫ থেকে ২৯ মিলিয়ন (২ কোটি নব্বই লক্ষ) মানুষ দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে মারা যায়।' পরবর্তী বহু ঐতিহাসিক বিশ্লেষণেই দেখা গেছে এর অনেকাংশই ছিল বৃটিশের সৃষ্টি। প্রসঙ্গত থারুর বাংলায় ১৯৪৩ যা পঞ্চাশের (ইংরেজি) মন্বন্তর নামে ইতিহাসে চির-কুখ্যাত দুর্ভিক্ষের উদাহরণ দেন।

গো-মূত্র রোগ প্রতিষেধক : কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ কাউন্সিল অব্ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ (সি এস আই আর) এবং গো-বিজ্ঞান অনুসন্ধান কেন্দ্র (জি ভি এ কে)-র যৌথ গবেষণায় উঠে এসেছে যে গো-মূত্র অ্যান্টি অক্সিড্যান্ট এবং অন্যান্য জৈব গুণ-সম্পন্ন। শুধু তাই নয়, সি এস আই আর এবং নাগপুরের জি ভি এ কে গো-মূত্রের নমুনা গবেষণা করে এও দেখেছে যে সংক্রমণ বিরোধী এবং ক্যান্সার প্রতিরোধী এজেন্ট-সহ এতে পুষ্টিমূল্যও কিছু রয়েছে। এক কথায়, যা গো-মূত্র রোগ প্রতিষেধক।

সুরাটের বিজেপি সাংসদ দর্শনা বিক্রম জারদোসের প্রশ্নের উত্তরে গত ২৪ জুলাই সংসদে স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীপাদ ইয়াসো নায়েক এই তথ্য জানান। তিনি আরও বলেন, ২০০২ সাল থেকেই এনিয়ে ৪টি মার্কিন পেটেন্ট নিশ্চিত হয়েছে এবং বাজারে গো-মূত্রের অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট গুণের জন্য এ থেকে তৈরি একটি ওষুধও পাওয়া যাচ্ছে। সরকারের কাছে গো-মূত্রকে ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে কিনা সেই প্রস্তাব বহুদিন ধরেই রয়েছে। এই প্রেক্ষিতেও এদিন লিখিত বিবৃতি পেশ করেন মন্ত্রী।

১৯৯৬ সালে একদল জাতীয়তাবাদী ভাবনার মানুষ নাগপুরে গো-বিজ্ঞান অনুসন্ধান কেন্দ্রের স্থাপনা করেন। শ্যামজী বল্লাল, মোরপন্থ পিংলের মতো দেশ-হিতৈষীরা ছিলেন এই কেন্দ্রের কর্মকাণ্ডের মূলে। এঁদের উদ্দেশ্য ছিল পরিবেশ-বান্ধব গো-কেন্দ্রিক অর্থনীতিকে দৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করা। এই প্রতিষ্ঠানের গবেষণায় গো-মূত্রের নানা ভেষজগুণ যেমন অ্যান্টি বায়োটিক, ছত্রাক-নাশক, এলার্জি-প্রতিরোধী, সংক্রমণনাশক, ক্যান্সার-প্রতিরোধকারী এমনকী কোষ-মৃত্যুর হাত থেকেও রক্ষা পেতে এর কার্যকারিতা ধরা পড়েছে। চীনে এই প্রতিষ্ঠানটি গো-মূত্রের একটি পেটেন্ট নিয়েছে। অবশ্য গো-মূত্রের কার্যকারিতা নিয়ে এই প্রয়াস নতুন নয়। ২০১৪-য় 'পঞ্চগব্য চিকিৎসা' নিয়ে একটি জাতীয় আলোচনা-চক্রের আয়োজন করেছিল সেন্ট্রাল কাউন্সিল ফর রিসার্চ ইন আয়ুর্বেদিক সায়েন্সেস। এই পঞ্চগব্য হলো দুধ, দই, ঘি, গো-মূত্র এবং গোময়। আয়ুষ রিসার্চ পোর্টালে এই আলোচনা-চক্রের গবেষণা-পত্রগুলির দিকে তাকালে গো-মূত্র যে বিভিন্ন আয়ুর্বেদিক পদার্থ ও প্রক্রিয়া যেমন শোধন ইত্যাদির সার্থক সমন্বয় তা বোঝা যায়।

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
3 August - 2015 - Rs. 10.00

দাম : ১০.০০ টাকা